Vol. I | Issue 4

বাংলা বিজ্ঞান কথা

ডিসেম্বর ২০২৩

দেশগঠনের কারিগর

একদল তরুণ বৈজ্ঞানিক এগিয়ে এলেন নতুন ভারত গড়ে তুলতে। এরা হলেন হোমি ভাবা, মেঘনাদ সাহা, শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর, বিক্রম সারাভাই, প্রমুখ। এই দলেরই অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিভা ছিলেন স্যার কে এস কৃষ্ণান।

- মাথাকাটা পিরামিড
- গবেষণায় স্বপ্রণোদিত নিয়ন্ত্রণ: এসিলোমার প্রস্তাব
- যারা আলো জ্বেলেছিল
- বিশ্ব উষ্ণায়ন ও ইতিহাসের উন্মুক্তি

Shanti Foundation

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

দেশগঠনের কারিগর ৬
অমিতেশ ব্যানার্জী

মাথাকাটা পিরামিড ৯
অভিজিৎ কর গুপ্ত

পুরুলিয়ায় রক অ্যাগামা ১২
অমর কুমার নায়ক

গবেষণায় স্বপ্রণোদিত নিয়ন্ত্রণ: এসিলোমার প্রস্তাব ১৪
সিদ্ধার্থ রায়

যারা আলো জ্বেলেছিল ১৭
অরুণাভ দত্ত

ওরা জলে চড়ে তাই জলপিপি ২০
তাপস কুমার দত্ত

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও ইতিহাসের উন্মুক্তি ২২
শীর্ষেন্দু গায়েন

আশ্চর্য ব্রহ্মান্ড ২৫
তুহিন সাজ্জাদ সেখ

ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ২৮

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ডিসেম্বর মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৩০

গ্রন্থ সমালোচনা ৩২

সম্পাদক সমীপেষু

সুধী সম্পাদক,

খুব ভালো এবং প্রয়োজনীয় একটি পত্রিকার সন্ধান ও যোগান দিলেন। তার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যেহেতু এরকম সুন্দর একটি প্রয়াস, তাই বলছি, পত্রিকার কিছু লেখাতে বেশ কয়েকটি বানান ভুল ও অসমতা চোখে পড়লো। সে দিকে যদি একটু গুরুত্ব দেন ভালো হয়। আর পত্রিকাটি কি কলেজ স্ট্রিট-এ কিনতে পাবো? নাহলে, কোথায় পাবো, যদি একটু জানান ভালো হয়।

মনোরঞ্জন নস্কর

সম্পাদকমন্ডলীর উত্তর

পত্রিকা প্রকাশনায় ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয় এই ত্রুটিগুলো কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে সতর্ক থাকবো। আপাতত পত্রিকাটি অনলাইনে প্রকাশিত হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে আমাদের ইচ্ছা আছে এটিকে ছাপার ফর্মে নিয়ে আসার। তখন বিজ্ঞান কথার সব পাঠককে জানানো হবে।

বিজ্ঞান কথা সম্পাদকমণ্ডলী

সুধী সম্পাদক,

খুব ভালো সংখ্যা হয়েছে। বিষয়গত ভবনা উত্তম। অঙ্গসজ্জাও দারুণ হয়েছে। আগামীদিনে আরও এগিয়ে যান।

গুঞ্জন ঘোষ
(gunjanghosh55@gmail.com)

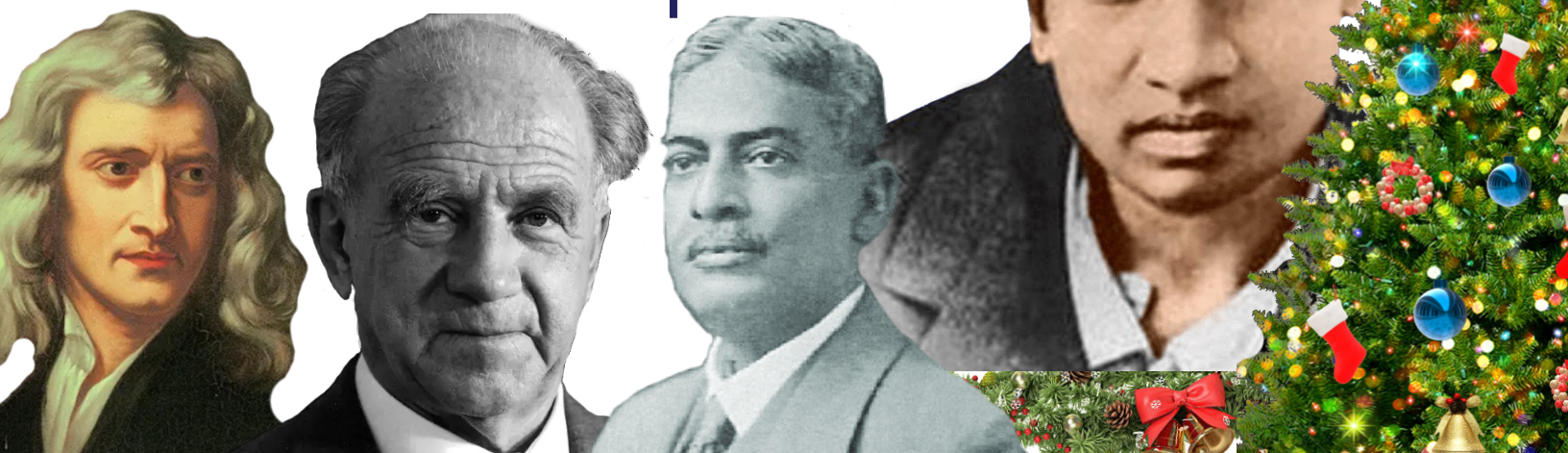

সম্পাদকীয়

ডঃ কৃষ্ণন এর অনুপ্রেরণায় স্বাগত নববর্ষ

2023 বিদায় দেওয়ার পর এবং আগামী 2024 সালের সূর্যোদয়ে স্বাগত জানানোর শুভক্ষণে শান্তি ফাউন্ডেশন সকলকে একটি আনন্দময় এবং সার্থক নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায়। এই বছর পরিবর্তনের মুহূর্তটি আমাদের ফিরে দেখার, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং আমাদের কাজের মূল্যায়ন করার সময়। আর বিজ্ঞান সচেতনতা বিস্তারে আমাদের যৌথ মিশনের প্রতি নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলার প্রয়াস।

নতুন বছরে আসুন আমরা আমাদের সামনে থাকা সুযোগগুলি উৎসাহ, আশা ও আনন্দে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করি। আমাদের চলার পথে আসা চ্যালেঞ্জগুলিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, দেখতে হবে যে, আমরা যাদের জন্য কাজ করছি তাদের জীবনে এই কাজ যেন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ সতত পরিবর্তনশীল, এবং সর্বদাই তার উন্মেষ ঘটছে।

অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ এই পথে আমরা আমদের যাত্রা নতুন বছরে আবার নতুন করে শুরু করতে চলেছি। নববর্ষ আমাদের আরও শক্তি যোগাক, আসুক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর আমাদের যৌথ উদ্যোগে সঞ্চারিত হোক নতুন সাফল্য। আসুন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি যাতে 2024 সালটি শান্তি ফাউন্ডেশনের আদর্শ নিয়ে একটি বৃদ্ধি, সহনশীলতা এবং জয়ের বছরে পরিণত হয়। আর এই কাজে আমরা অনুপ্রাণিত হব 125 বছর আগে যে বিজ্ঞানী জন্মেছিলেন সেই ডঃ কারিয়ামানিক্কম শ্রীনিভাস কৃষ্ণনের কাজ থেকে।

ভারতীয় বিজ্ঞানে ডঃ কে এস কৃষ্ণনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছড়িয়ে রয়েছে প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাত্তোর ভারতে এবং সেই অবদান রয়েছে বিজ্ঞানের নানা শাখায়। 1898 সালের 4 ডিসেম্বরে, তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিরুবাইয়ূরে জন্মগ্রহণ করেন, ডঃ কৃষ্ণন। বিজ্ঞানের পথে তার যাত্রা একটি অকল্পনীয় নিষ্ঠা, জ্ঞানার্জনের প্রতি তার অসীম আগ্রহ এবং একেবারে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার একেবারে প্রথম সারির সাফল্য তাকে করে তুলেছে এক অনন্য মানুষ।

তার উচ্চমানের দিকদর্শী গবেষণা ছাড়াও, ডঃ কে এস কৃষ্ণন নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক ক্যানভাস তৈরির কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি দিল্লীর ন্যাশানাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির নির্দেশক এবং পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একদিকে বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্র বিস্তারের প্রয়াস নিয়েছিলেন, অন্যদিকে উৎকর্ষতার প্রতি তার দৃষ্টি ছিল প্রখর।

ডঃ কৃষ্ণনের কাজের প্রভাব ল্যাবরেটরির বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক নীতি নির্ধারণের বিষয়ে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উন্নত ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন আর তার ফলেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে আর যুক্ত হয়েছিলেন অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের সঙ্গে।

বিজ্ঞানের জনকল্যাণকারী শক্তি সমস্ত সামাজিক বাধা ভেঙ্গে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে সক্ষম। শান্তি ফাউন্ডেশন, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এই উদ্যোগের অন্যতম পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পরা ছাত্র, মহিলা এবং বধির ও মূক সম্প্রদায়ের কাছে মৌলিক সুবিধাগুলির সাথে সাথে বিজ্ঞানমনস্কতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

শান্তি ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগের অন্যতম মূল উপাদান হল জনপ্রিয় বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা "বিজ্ঞান কথা"। shantifoundation.global-এ উপলব্ধ এই প্রকাশনাটি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে দায়বদ্ধ যা বিজ্ঞানকে সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে এই উদ্যোগের সম্প্রসারণ, নিশ্চিত করা যে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা যেন ভাষাগত এবং ভৌগলিক সীমানা অতিক্রম করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই উদ্যোগটি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসাম এবং ত্রিপুরার বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনায় শান্তি ফাউন্ডেশন বিশেষভাবে উদ্যোগী। বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে শান্তি ফাউন্ডেশন এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সচেষ্ট যেখানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলো দেশের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে যায়।

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের সাথে শান্তি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নতির প্রতিশ্রুতির উদাহরণ। বাংলার ঐতিহ্যশালী বিজ্ঞানমনস্কতার ধারাকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে আরও বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষিত ও উন্নয়নশীল সমাজের পথ প্রশস্ত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। "বিজ্ঞান কথা"-র মতো উদ্যোগের মাধ্যমে শান্তি ফাউন্ডেশন এই পরিবর্তনের শরিক হবে বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞান ভাবনায় সমৃদ্ধ এক উন্নত জাতি গঠনে।

আশা, সমৃদ্ধি এবং সীমাহীন সম্ভাবনায় ভরা নতুন সূচনার বার্তা নিয়ে আসা শুভ নববর্ষের প্রাক্কালে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ডঃ নকুল পারাশর

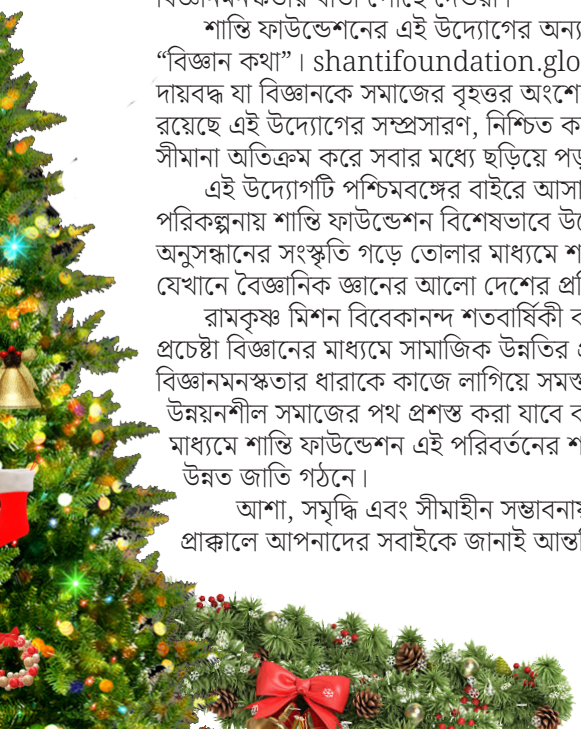

বাংলা বিজ্ঞান কথা

December 2023 | Vol. I | Issue 4

উপদেষ্টামণ্ডলী

স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
প্রোঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ ভূপাতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

এবং

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

Shanti Foundation

বিজ্ঞান সংবাদ

মহাবিশ্বে প্রাণের বিস্তারে ধূমকেতু

কিভাবে পৃথিবীতে জীবনের এককের উদ্ভব হল? কিছু বিজ্ঞানীর মতে এর জন্য দায়ী ধূমকেতু। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে লাফিয়ে পড়া ধূমকেতুই ছিল প্রাণের এককের বাহক। এই জৈব উপাদান বহন করার জন্য ধূমকেতুর গতি সেকেন্ডে 15 কিলোমিটারের বেশি হাওয়া চলবে না, কারণ এর চেয়ে বেশি গতিতেতাপমাত্রা এবং গতির প্রভাবে জৈব অণুগুলি ভেঙে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু এই গতিবেগ যে কোনো ধূমকেতুর ক্ষেত্রেই খুবই কম। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে কিভাবে প্রাণের একক ধূমকেতু বাহিত হয়ে পৃথিবীতে আসে পৌছালো? *প্রসিডিংস অফ দ্য রয়্যাল সোসাইটি এ*-তে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সম্ভবত এটা ঘটার জন্য দায়ী "peas in a pod" ব্যবস্থা। এই ধরনের গ্রহ ব্যবস্থায়, একদল গ্রহ একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে প্রদক্ষিণ করে। এখানে, ধূমকেতুগুলি এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে লাফিয়ে পরার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ধূমকেতুর গতি অনেক কমে যায়। যদি জীবনের উৎস ধূমকেতুর মাধ্যমেই পরিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে জীবনের উৎস সন্ধানে এই ধরনের গ্রহ ব্যবস্থা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হতে পারে। ধূমকেতুতে সাধারণভাবে জীবনের একক হিসাবে বিবেচিত নানান অণু উপস্থিত থাকে। জাপানি অন্তরীক্ষ সংস্থার হায়াবুসা-2 মিশন 2019 সালে গ্রহাণু রিউগু থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছিল যার মধ্যেও উরাসিল এবং নিয়াসিন-এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ইউরাসিল হল RNA এর রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে একটি। নিয়াসিন, ভিটামিন বি-3 বা নিকোটিনিক অ্যাসিড নামেও পরিচিত যা বিপাকের জন্য অপরিহার্য। কীভাবে হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN)-এর মতো জটিল অণু সফলভাবে ধূমকেতু দ্বারা পরিবাহিত হতে পারে এই গবেষণা সেই বিষয়েই আলোকপাত করেছে। ●

সবচেয়ে দূরবর্তী দুটি ছায়াপথ

বিজ্ঞানীরা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে প্যান্ডোরার ক্লাস্টার নামে পরিচিত মহাকাশের একটি অংশে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ-সবচেয়ে দূরবর্তী ছায়াপথ আবিষ্কার করেছেন। প্রায় 33 বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরবর্তী এই ছায়াপথগুলি থেকে ছায়াপথ গঠনের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া বোঝা যেতে পারে। এই পর্যবেক্ষণ সম্প্রতি *অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স*-এ প্রকাশিত হয়েছে। পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা অনুমান করেছেন যে ওয়েব টেলিস্কোপ দ্বারা শনাক্ত করা আলো ছায়াপথগুলি থেকে প্রায় 13.4 বিলিয়ন বছর আগে নির্গত হয়েছিল। সেই সময়, মহাবিশ্বের বয়স ছিল প্রায় 330 মিলিয়ন বছর। সময়ের সাথে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কারণে ছায়াপথগুলি বর্তমানে আমাদের থেকে 33 বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে 2022 সালে প্যান্ডোরার ক্লাস্টারের গভীর অভ্যন্তরের ছবি তোলা হয়। ছবিতে 60,000টিরও বেশি আলোর উৎস ছিল। এই অঞ্চলটি নির্বাচন করা হয়েছিল কারণ এটি অনেক দূরবর্তী ছায়াপথ যা গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং নামে একটি অবস্থানগত প্রভাব তৈরি করতে পারে। মূলত, একটি নিকটবর্তী ছায়াপথের মহাকর্ষীয় টান মহাশূন্যের চারপাশের স্থানকে বাঁকিয়ে দেয়, ফলে পিছন থেকে আসা আলোর গতিপথ পরিবর্তিত হয় এবং এটি এক ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস হিসেবে কাজ করে। গবেষকরা এই প্রাথমিক ছায়াপথগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করতে গণনামূলক মডেলও ব্যবহার করেছিলেন। দেখা গেছে, দুটি ছায়াপথেই তাদের গঠনকালে স্বল্প কিছু ধাতু উপস্থিত ছিল এবং তারা দ্রুত বর্ধিত হয় এবং সক্রিয়ভাবে তারকা গঠন করতে শুরু করে। ●

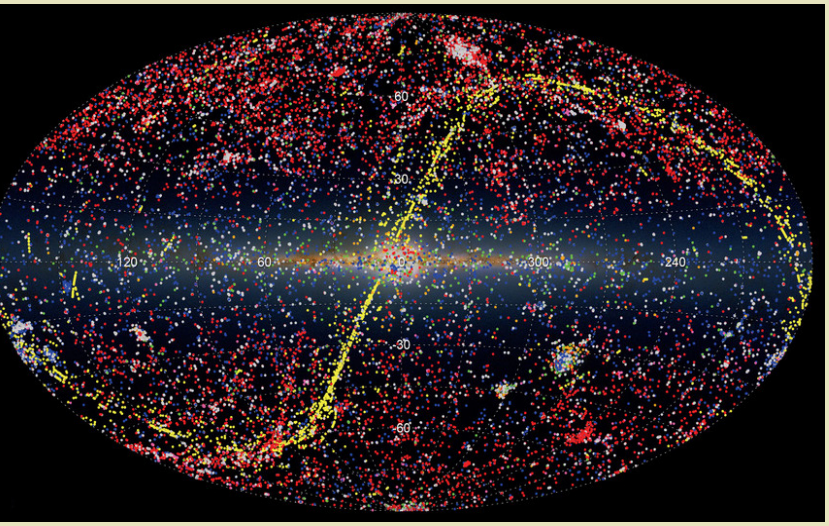

সিন্থেটিক ডিএনএ সহ খামির স্ট্রেন

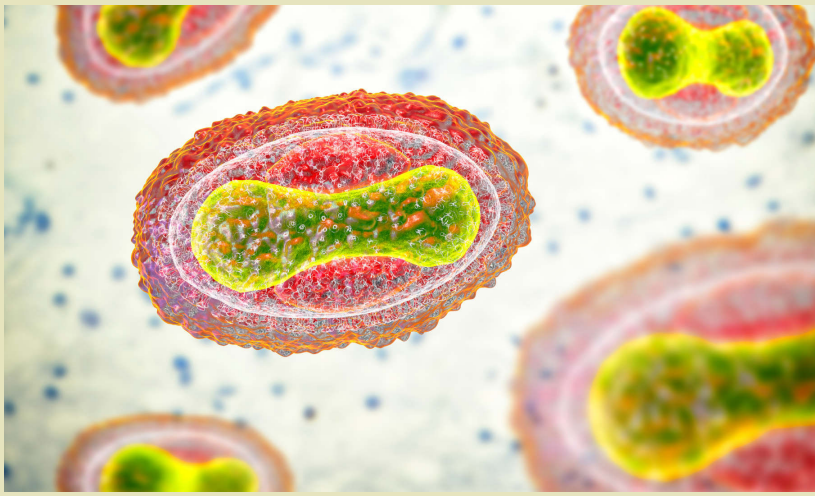

সম্পূর্ণ সিন্থেটিক জিনোম দিয়ে জটিল কোষ তৈরির যাত্রায় বিজ্ঞানীরা একটি বড় মাইলফলক সম্পন্ন করেছেন। জীববিজ্ঞানীরা খামিরের একটি স্ট্রেন তৈরি করেছেন যার একটি জিনোমে রয়েছে 50 শতাংশের বেশি সিন্থেটিক ডিএনএ। স্ট্রেনের 16টি ক্রোমোজোমের অর্ধেকটি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষাগারে ডিজাইন করে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছিল। বেশ কিছু গবেষণাগার Sc2.0 কনসোর্টিয়াম নাম নিয়ে যৌথভাবে গত 15 বছর ধরে সম্পূর্ণ কৃত্রিম জিনোম দিয়ে খামিরের একটি স্ট্রেন তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো যা অবশেষে আংশিক সাফল্য লাভ করে। এই সাফল্যের খবর সম্প্রতি সেল এবং সেল জিনোমিক্স জার্নালের একাধিক গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। *নেচার* পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্র অনুসারে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ কৃত্রিম জিনোম সম্বলিত বেশ কিছু ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলির জেনেটিক কাঠামো ছিল অত্যন্ত সরল। তাদের সাধারণ অভ্যন্তরীণ গঠনেও বিশেষ জটিলতা ছিল না। *নিউ সায়েন্টিস্ট* পত্রিকার মতে, Sc2.0 গবেষণা দলটি তাদের গবেষণার জন্য ব্রিউয়ারের খামির নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন যাতে তাঁরা জটিল কোষগুলির জিনোমিক গঠন আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন এবং ভবিষ্যতে শিল্পোদ্যোগে ব্যবহারের জন্য স্ট্রেন তৈরি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁরা খামিরের স্ট্রেন তৈরি করতে উদ্যোগী হন যা বিয়ার উৎপাদনে সীমাবদ্ধ না থেকে ওষুধ এবং জৈব জ্বালানি তৈরিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা 16টি ইস্ট ক্রোমোজোমেরই কৃত্রিম সংস্করণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এগুলিকে খামিরের একটিমাত্র স্ট্রেনে সম্বলিত করতে আরও এক বছর বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে। ●

একটি হারিয়ে যাওয়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর পুনরাবিষ্কার

ইন্দোনেশিয়ার সাইক্লোপস পর্বতমালায় সর্বশেষ রেকর্ড হওয়ার 60 বছরেরও বেশি সময় পরে বিজ্ঞানীরা একটি হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীকে পুনরায় আবিষ্কার করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে চার সপ্তাহের অভিযানের শেষ দিনে এই প্রাণীটি তাদের ক্যামেরায় ধরা দেয়। ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ ডেভিড অ্যাটেনবারোর নামানুসারে এর নাম অ্যাটেনবোরোর লম্বা ঠোঁটওয়ালা ইচিডনা। পর্যবেক্ষণ শেষে পাহাড় থেকে নেমে এসে, জীববিজ্ঞানী জেমস কেম্পটন 80 টিরও বেশি রিমোট ক্যামেরার মেমরি কার্ড দেখার সময় শেষ মেমরি কার্ডে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া এই ছোট প্রাণীর ছবি খুঁজে পান। ইন্দোনেশিয়ান সংরক্ষণ গোষ্ঠী YAPPENDA-এর সহযোগীদের সাথে প্রথমবার ফুটেজটি দেখার মুহূর্তটির বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, পর্যবেক্ষণের শেষ দিনে এই প্রাণীটির ছবি তাঁদের জন্য এক বিশেষ প্রাপ্তি। ইচিডনা নামটি একটি অর্ধ-নারী, অর্ধ-সর্প গ্রীক পৌরাণিক প্রাণীর থেকে নেওয়া। এই প্রাণীটি লাজুক, নিশাচর ও গর্ত-নিবাসী হিসাবে পরিচিত যাদের সাধারণভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই প্রাণীটির বিশেষত্ব হল, এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও ডিম-প্রদায়ী গোষ্ঠী মনোট্রেমসের সদস্য এবং প্রায় 200 মিলিয়ন বছর আগে এই প্রজাতিটি বাকি স্তন্যপায়ীদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর আগে একবারই মাত্র 1961 সালে ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী দ্বারা প্রজাতিটি বৈজ্ঞানিকভাবে শুধুমাত্র একবার রেকর্ড করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ গিনি জুড়ে ইচিডনার একটি ভিন্ন প্রজাতি পাওয়া যায়। ●

দেশগঠনের কারিগর

অমিতেশ ব্যানার্জী

1947 সাল। সদ্য স্বাধীন দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। স্বনির্ভর দেশের প্রাথমিক চাহিদা হল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সামাজিক উন্নয়ন। সেটার জন্য দরকার সুগঠিত কৃষি ও শিল্পনীতি। সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ। একদল তরুণ বৈজ্ঞানিক এগিয়ে এলেন নতুন ভারত গড়ে তুলতে। এরা হলেন হোমি ভাবা, মেঘনাদ সাহা, শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর, বিক্রম সারাভাই, প্রমুখ। এই দলেরই অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিভা ছিলেন স্যার কে এস কৃষ্ণান। এবছর তাঁর জন্মের 125 বছর উজ্জাপিত হতে চলেছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বিজ্ঞানসাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

স্যার কারিয়ামানিক্কম শ্রীনিভাস কৃষ্ণানের জন্ম 1898 সালের 4ঠা ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর শ্রীভিল্লিপুত্তুর মন্দিরনগরীর নিকটবর্তী ভিঝুপানুর গ্রামে। পিতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ছিলেন পেশায় কৃষক। ছাত্রজীবনের সূচনা ওয়াট্রাপ শহরের হিন্দু হাই স্কুলে। সেখান থেকে মাদুরাই আমেরিকান কলেজ হয়ে মাদ্রাস্ খৃষ্টিয়ান কলেজ। স্বপ্নে তখন বিজ্ঞান জগতের দুই দিকপাল, রামানুজন ও রামান। শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সেস। দুই জায়গাতেই শিক্ষক হিসাবে পেলেন রামনকে। বিজ্ঞানের সাধনা শুরু হল মন-প্রাণ উজাড় করে।

1920 সালে কলকাতা আসার পর কৃষ্ণানের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সাথে সাথে গবেষণার কাজ চলতে থাকে অ্যাসোসিয়েশনে। সেখানে তখন রামন আলোকের বিচ্ছুরণের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণান ছিলেন এই গবেষণার অন্যতম সহায়ক। 1928 সালের 16ই ফেব্রুয়ারী রামন ও কৃষ্ণান যৌথভাবে A new type of secondary radiation নামক একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণাপত্র লন্ডনের ‘নেচার’ পত্রিকায় পাঠান, যেটি ওই বছর 31শে মার্চ প্রকাশিত হয়। অবশেষে এল 28শে ফেব্রুয়ারী। কৃষ্ণানের ওই সময় নিয়মিতভাবে লেখা ডাইরিতে ওই দিনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হল,

> “আমি বিকালে অ্যাসোসিয়েশনে পৌঁছাই। প্রফেসর (রামন) তখন সেখানেই ছিলেন। আমরা যে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, আপতিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তার ওপর কোনো প্রভাব আছে কিনা জানার জন্য আমরা সে বিষয়ে পরীক্ষা করা শুরু করি। নীল-বেগুনি ফিল্টারের সাথে ইউরেনিয়াম কাঁচ যোগ করে দেখা গেল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রসার অনেক কমে গেছে, যেখানে ইউরেনিয়াম কাঁচের অনুপস্থিতিতে নীল-বেগুনি ফিল্টারের প্রভাবে এই প্রসার অনেক বেশি ছিল। ডাইরেক্ট ভিশন স্পেক্ট্রোস্কোপে পরীক্ষা করে আপতিত রশ্মি বিক্ষেপণ ও পরিমিত বিক্ষেপণ পথরেখার মধ্যে একটা কালো অঞ্চল ধরা পড়লো।”

পরীক্ষাজনিত ত্রুটি কাটানোর জন্য তারা পারদের বৃত্তচাপ আকৃতির আলোক উৎস ব্যবহার করলেন এবং তার ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা রামন প্রভাব আবিষ্কৃত হল। এরপর রামন 8ই মার্চ এককভাবে A change of wavelength in light scattering শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র ‘নেচার’ পত্রিকাতে পাঠান। এই গবেষণাপত্রে উল্লিখিত সব সিদ্ধান্ত সার্বিকভাবে সঠিক ছিল না। তাই 22শে মার্চ আবার রামন ও কৃষ্ণান যৌথভাবে The optical analogue of the Compton effect শীর্ষক আরেকটি গবেষণাপত্র পাঠান ‘নেচার’ পত্রিকাতে। 1930 সালে রামন প্রভাব আবিষ্কারের জন্য রামন এককভাবে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণানও এই পুরস্কারের সমান ভাগিদার ছিলেন, সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় রামন প্রভাব আবিষ্কারে কৃষ্ণানের ভুমিকা অনস্বীকার্য।

রামন প্রভাব আবিষ্কারের বছরেই বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আর্নল্ড সামারফিল্ড ভারতে

আসেন। কলকাতায় তরঙ্গ বলবিদ্যার ওপর তার সাতটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয় যাতে ভারতের বিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষকদের কাছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারা উন্মুক্ত হয়। প্রথম দুটি ও শেষ তিনটি বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেন কৃষ্ণান। বাকি দুটি লিপিবদ্ধ করেন অধ্যাপক নিখিল রঞ্জন সেন। পরবর্তীকালে এই বক্তৃতাগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় সামারফিল্ড কৃষ্ণানের কাজের প্রভূত প্রশংসা করেন।

1928 সালের শেষের দিকে এস এন বোসের উদ্যোগে কৃষ্ণান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এই সময় থেকেই আলোর বিচ্ছুরণের ওপর তার গবেষণার সমাপ্তি। এবার তিনি খুঁজে নিলেন গবেষণার নতুন বিষয়—কেলাসের অণুগুলির মূল বৈশিষ্ট নির্ণয় এবং পরাচৌম্বকীয় লবণের চৌম্বক ধর্ম নির্ণয়। যদিও গবেষক জীবনের শুরুতে তিনি এই বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, আলোর বিচ্ছুরণের ওপর গবেষণার সময় তিনি এই গবেষণাগুলি সাময়িক বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

1933 সালের মাঝামাঝি কৃষ্ণান আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং অ্যাসোসিয়েশনে মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক এবং এসোসিয়েশনের সচিব পদে যোগ দেন। ঢাকার অসমাপ্ত গবেষণা চলতে থাকে এখানে। 1940 সালে কৃষ্ণান লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। কৃষ্ণানের হাত ধরেই ভারতে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় বা ক্রায়োজেনিক গবেষণার সূচনা। ঢাকা ও কলকাতার এই সময়কালে কৃষ্ণান তৈরী করেছিলেন এক সুযোগ্য ছাত্রগোষ্ঠী যারা পরবর্তী সময়ে তাদের উচ্চমানের গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে। ইতিমধ্যে বেজে উঠেছে বিশ্বযুদ্ধের দামামা। কলকাতা তখন কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। ঘনঘন বোমারু বিমানের হানা। কৃষ্ণান তখন কলকাতা ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

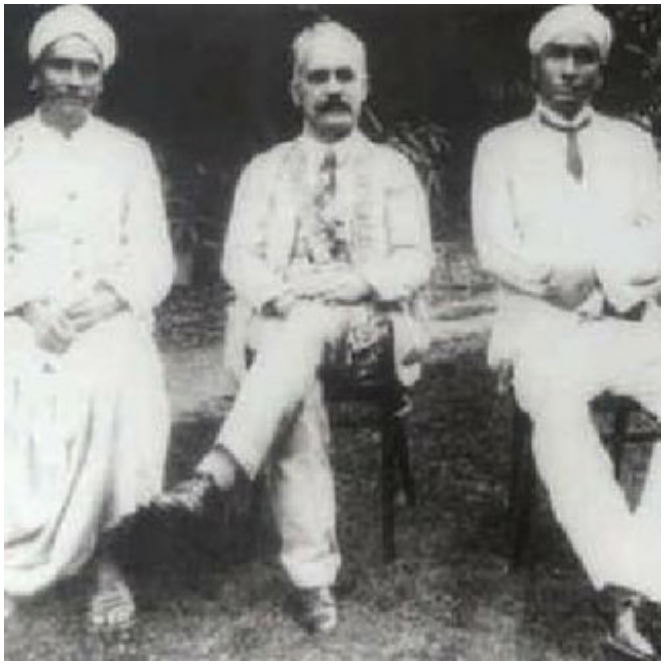

কৃষ্ণান, সামারফিল্ড ও রামন

যেসব বিজ্ঞানীদের হাতে নেহেরু দেশের অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নীতি নির্ধারণের ভার তুলে দিয়েছিলেন, কৃষ্ণান ছিলেন তাদের অন্যতম।

1942 সালে কৃষ্ণান পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানেও তিনি ব্রতী হন ছাত্রদের বিজ্ঞান প্রতিভার বিকাশে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অপ্রতুলতা ও যুদ্ধকালীন আবহে উচ্চমানের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগার গড়ে তুলতে পারলেন না। ফলে তার গবেষণার কাজ কার্যত বন্ধ রইল বেশ কয়েক বছর। এখানে কাজ করার সময়ে ১৯৪৬ সালে বাকিংহাম প্যালেস কৃষ্ণানকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে। কলকাতায় থাকাকালীন কৃষ্ণানের সাথে জওহর লাল নেহরুর পরিচয় হয়। এলাহাবাদে কাজ করার সুবাদে নেহরুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে বন্ধুত্বের রূপ পেল। দেশ স্বাধীন হবার পর যেসব বিজ্ঞানীদের হাতে নেহেরু দেশের অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নীতি নির্ধারণের ভার তুলে দিয়েছিলেন, কৃষ্ণান ছিলেন তাদের অন্যতম।

1947 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 37তম অধিবেশনে নেহেরু কৃষ্ণানকে পাকাপাকিভাবে দিল্লী আসার কথা বলেন। যদিও এই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে কৃষ্ণান যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন, শেষে বন্ধু চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর পরামর্শে দিল্লী যাওয়ায় স্থির করলেন। ওই বছরই কৃষ্ণান সদ্য

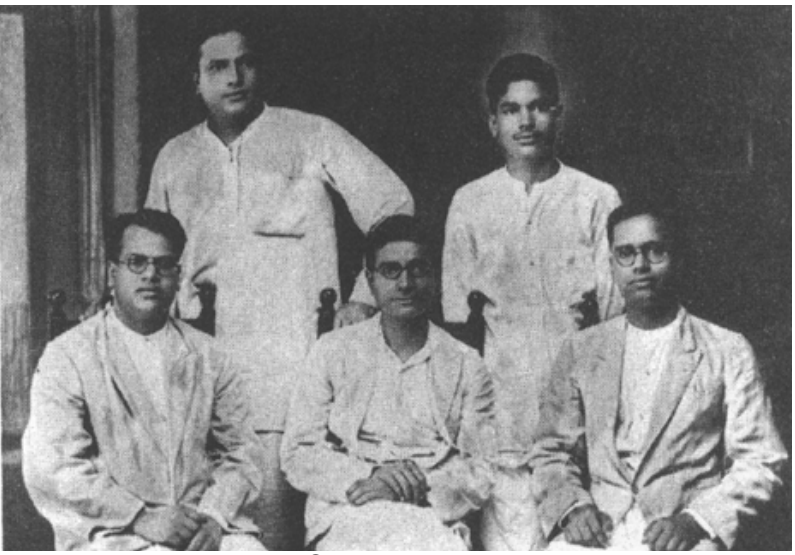

রামন প্রভাব আবিষ্কারের সাথে যুক্ত রামনের ছাত্রদল। (বসে) এস ভেঙ্কটেশ্বরণ, কে এস কৃষ্ণান, এ এস গনেশন, (দাঁড়িয়ে) সি মহাদেবন, এস ভগবন্তম।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাথে কৃষ্ণান

প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার (NPL)-এর নির্দেশক মনোনীত হলেন। এলাহাবাদ ত্যাগ করে কৃষ্ণান চলে এলেন দিল্লিতে। কৃষ্ণানের জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

তখন NPL-এর দফতর ছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যের অনুরোধে কৃষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক সাম্মানিক অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন। শিক্ষকতা ও ছাত্র তৈরী সর্বদাই ছিল তার পছন্দের কাজ। সাথে ছিল NPL-এর নিজস্ব দফতর তৈরির এবং বিশেষভাবে উচ্চমানের গবেষণার যোগ্য গবেষণাগার গড়ে তোলার দায়িত্ব। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য হলেও কৃষ্ণান যোগ্যতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তাকে নানা প্রশাসনিক কাজেও বহু সময় ব্যয় করতে হতো। 1948 সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসে কৃষ্ণানকে পরবর্তী বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করা হয়।

1950 সালে UNESCO-র সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন কৃষ্ণান। আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে সাধনে এই সভা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

1948 সালের 15ই অগাস্ট নেহেরু অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হন হোমি ভাবা, সদস্য নির্বাচিত হন কৃষ্ণান। আণবিক শক্তির ক্ষেত্রে দেশ ও জাতিকে স্বনির্ভর ও অগ্রগণ্য করে তুলতে কৃষ্ণান এক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেন। ওই বছর শেষের দিকে কৃষ্ণান ইউরোপ যান। সেসময় কমনওয়েলথ সম্মেলনে নেহরুও সেখানে উপস্থিত। তারা দুজনে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি, প্যারিস, সুইডেনে বহু বিজ্ঞানীর সাথে আলোচনা করে NPL-এর গবেষণাগারের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেন। 1950 সালে UNESCO-র সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন কৃষ্ণান। আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে সাধনে এই সভা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরই NPL-এর নতুন ভবন ও গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়।

1953 সালে কৃষ্ণান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। 1957 সালে আন্তর্জাতিক ভূভৌতিক বছর পালিত হয় এবং কৃষ্ণান ছিলেন এই সংক্রান্ত ভারতীয় কমিটির চেয়ারম্যান। হৃদরোগ জনিত অসুস্থতা সত্ত্বেও কৃষ্ণান সফলভাবে এই দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীন দেশে বৈজ্ঞানিক ও ঔদ্যোগীক অনুসন্ধান পরিষদ (CSIR) প্রতিষ্ঠিত হলে এর নির্দেশক হন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর। এই সংস্থার অন্যতম সদস্য ছিলেন কৃষ্ণান। সদ্য স্বাধীন দেশে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কৃষ্ণানের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। ডঃ ভাটনাগরের মৃত্যুর পরে 1957 সালে ভারত সরকার বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বীকৃতি হিসাবে ভাটনাগর পুরস্কারের প্রবর্তন করে। দেশের মধ্যে বিজ্ঞানে অবদানের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি হিসাবে মান্য। 1958 সালে পদার্থবিদ্যা বিভাগে প্রথম এই পুরস্কার পান কৃষ্ণান। এছাড়াও ভারত সরকার 1954 সালে কৃষ্ণানকে পদ্মবিভূষণ ও 1958 সালে জাতীয় অধ্যাপক উপাধিতে ভূষিত করে। মাদ্রাস্ (বর্তমানে চেন্নাই) বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণানকে গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে ডিএসসি উপাধি দেয়। লখনৌ, কলকাতা, এলাহাবাদ, যাদবপুর প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও তাকে সাম্মানিক ডিএসসি উপাধি প্রদান করা হয়।

কৃষ্ণান ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। স্বভাব শিক্ষক এই মানুষটির হাত ধরে দেশের যে উচ্চশিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল আজও তা শক্ত ভিতের মতো দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে ধরে রেখেছে। শিল্প, কলা, সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার গড়ে তোলার পেছনেও কৃষ্ণানের অবদান অসীম। UNESCO-র সাথে ভারতের সহযোগিতাকারী কমিশনের প্রকৃতিবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণান। জাতীয় ভূপদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার তৈরির পরিকল্পনার সূচনাকাল থেকেই তিনি এর সাথে জড়িত ছিলেন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। সুযোগ পেলেই সকালে টেনিস খেলতেন। ফুটবল ও ক্রিকেটেও তার সমান আগ্রহ ছিল।

1961 সালের 14ই জুন মধ্যরাত্রে দিল্লির বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কৃষ্ণানের মৃত্যু হয়। পদার্থবিদ্যার দুনিয়ায় এ ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। ভারতবর্ষ হারালো বহুমুখী প্রতিভাধর এবং অতুলনীয় সংগঠক এক মনীষীকে। ●

*লেখক **শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জী** বিজ্ঞানকর্মী ও এই পত্রিকার সাথে যুক্ত। ইমেল: amiteshbanerjee1@gmail.com*

মাথাকাটা পিরামিড

অভিজিৎ কর গুপ্ত

একটা মিশরীয় প্যাপিরাস রোল, 18 ফুট লম্বা আর কমবেশি 1.5 থেকে 3 ইঞ্চি চওড়া। অদ্ভুত সব সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে কী সব যেন লেখা তাতে! মিশরের উত্তরে লাক্সোর শহরের কাছে নীল নদের উল্টো দিকে সুপ্রাচীন থিবেস শহরের ধ্বংসাবশেষ। এখন সেটা দাইয়ের আল বাহেরি কমপ্লেক্স। এখানে রয়েছে বহু মনুমেন্ট, মন্দির, আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা অনেক কবর। মিশরীয় কবরস্থান—the Valley of Kings! এখান থেকেই পাওয়া ওই প্যাপিরাস রোল মিশরের দুই কুখ্যাত চোরের হাত ঘুরে এক সময় পৌঁছে গিয়েছিল রাশিয়ার রাজধানী মস্কো-তে। মিশর এবং অন্যত্র চোরাচালানকারীরা হামেশাই কবর থেকে লুকিয়ে তুলে আনত নানান মূল্যবান জিনিসপত্র। চড়া দামে সেসব বিক্রি করত বিদেশীদের কাছে। তারমধ্যেই কখনো সখনো থাকতো এইরকম প্যাপিরাস পাতার রোল।

মিশরীয়রা পাথরে খোদাই করে নানান সাংকেতিক চিহ্ন ও ছবি এঁকে লিখে রাখতো রাজার নির্দেশ ও হরেক নিয়মাবলী এবং কতসব দৈনন্দিন হিসাবনিকাশ, জমির মাপঝোঁক ইত্যাদি। নীল নদের অববাহিকায় প্যাপিরাস গাছ জন্মাতো খুব। তাই প্যাপিরাস পাতা জুড়ে জুড়ে রোল বানিয়ে লেখার কাজ চলতো মূলত কালো আর কিছুটা লাল কালি দিয়ে। কখনো আবার চামড়ার উপরও লেখা হতো। তবে, প্যাপিরাস পাতার মতো দীর্ঘস্থায়ী হয় নি সেসব।

প্রাচীন মিশরের ভাষা হায়ারোগ্লিফিক্স-এর রহস্য নিয়ে মানুষ চর্চা করেছে দীর্ঘকাল ধরে, এখনো গবেষণা চলেছে। দেখলে মনে হবে সারিবদ্ধ সাজানো কিছু ছবি—পাখি, মানুষের অবয়ব, হাত-পা-এর চিহ্ন, পিরামিড বা পাহাড়, কিছু জ্যামিতিক চিত্র অথবা কিছু অজানা সিম্বল। ছবির মতো সুন্দর অথচ এক অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা এই হায়ারোগ্লিফিক্সের স্ক্রিপ্ট! দীর্ঘ সময় ধরে তার রহস্য অধরাই থেকে গিয়েছিল। আসলে, এরকম কোনো চালু ভাষাই তো আর দেখা যায় নি পরবর্তীকালে। এই ভাষা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল খ্রিষ্টিয় প্রথম শতকের মধ্যেই। সেসময় গ্রীস সভ্যতার রমরমা শুরু হয়েছে।

অনেকেই হয়ত বিখ্যাত রোসেটা স্টোন-এর কথা শুনেছে। একটা পাথরের স্ল্যাব, উপরদিকটা খানিকটা ভাঙা, নীল-এর ধারে রোসেটা শহরে তা পাওয়া গিয়েছিল হঠাৎ করেই। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যখন মিশর অভিযান করেন, সময়টা 1798 থেকে 1801 সাল, সেই বাহিনীতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পন্ডিত মানুষ, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গণিতজ্ঞরাও ছিলেন। জানা যায়, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ জোসেফ ফ্যুরিয়ার, যার নামে ফ্যুরিয়ার সিরিজ, উঁচু ক্লাসে সেসব অঙ্ক শেখানো হয়, তিনিও ছিলেন সেই দলে। উদ্দেশ্য ছিল ভূমধ্যসাগরের এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা। তার জন্য মিশরীয় সভ্যতাকে জানা দরকার। ওদিকে ভারতে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার হচ্ছিল, সেদিকেও নজর ছিলো নেপোলিয়নের। নেপোলিয়নের সেনারা রোসেটা শহরের এদিক ওদিক টহল দিতে দিতে হঠাৎ করেই এই বিশেষ পাথর খন্ডটা দেখতে পায়। সাংকেতিক কিছু ভাষায় কিছু খোদাই করা ছিল এর উপর। নেপোলিয়নের বাহিনীর পন্ডিত মানুষেরা, প্রত্নতাত্ত্বিকরা বুঝলেন এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে। কাজেই সযত্নে সংগ্রহ করা দরকার।

সেই রোসেটা স্টোন এখন সযত্নে রাখা আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। যদিও তা থাকার কথা ছিল ফরাসীদের জিম্মায়। তবে, কালেচক্রে ব্রিটিশরা এর দখল নেয়। ব্রিটিশদের কাছে নেপোলিয়ানের বাহিনীর পরাজয়ের পর দুপক্ষের মধ্যে একটা চুক্তি (Treaty of Alexandria) হয়। ফরাসীরা এই অঞ্চলে পাওয়া সব মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস ব্রিটিশদেরকে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। রোসেটা স্টোনের মত এমন একটা আপাত গুরুত্বপূর্ণ রহস্যময় বস্তুকে ঘিরে সারা পৃথিবীর মিশরবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক, গবেষকরা শুরু করে দেন তাঁদের গবেষণা ও অনুসন্ধান। তাঁরা জানতে চাইছিলেন কী লেখা আছে এতে।

বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ থমাস ইয়ং-এর নাম অনেকেই শুনেছে। আলোক তরঙ্গ, কঠিন পদার্থের ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো পদার্থবিদ্যার টেক্সট বইতে পড়তেই হয়। তবে, পদার্থবিদ্যা ছাড়াও শারীরবিদ্যা এবং মিশরতত্ত্বের উপর যে তাঁর পান্ডিত্য ছিল এটা হয়ত আমাদের অনেকেরই অজানা। তিনি রোসেটা স্টোন খুঁটিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত করেন—মনে হচ্ছে কিছু কিছু সিম্বল বা স্ক্রিপ্ট রয়্যাল ফ্যামিলির কোনো নাম-কে নির্দেশ করছে! রোসেটা স্টোন নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা চলতে থাকে দীর্ঘকাল ধরে। অনেক পন্ডিত মানুষ—প্রত্নতত্ত্ববিদ, মিশরতত্ত্ববিদরা সামিল হন এতে। অবশেষে ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক স্যাম্পোলিঁয় উদ্ধার করেন এর আসল রহস্য। সেটা 1822 সালের কথা। জানা যায়, তিনটে ভাষায় সেখানে লেখা আছে একই কথা। আসলে তা ছিল তখনকার নতুন রাজা পঞ্চম টলেমি-এর কিছু নির্দেশ। একটা অংশ হায়ারোগ্লিফিক্স, আরেকটা অংশ-তে সাধারণের জন্য ডেমোটিক হরফে লেখা এবং তৃতীয় অংশে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় খোদাই করা। অনেকটা যেমন, আমাদের রেলস্টেশনগুলির নামের ফলকে বাংলা-হিন্দী-ইংরেজিতে লেখা থাকে।

প্রাচীন গ্রীক ভাষার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে অবশেষে হায়ারোগ্লিফিক্স স্ক্রিপ্টের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হয়। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এ ছিল এক বিরাট ল্যান্ডমার্ক! এরপরই মিশরীয় চর্চায় নতুন দিগন্ত খুলে যায়! মিশরের নানান রহস্য উন্মোচিত হতে থাকে একে একে। বলা হয়, এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার! 'রোসেটা' কথাটা উপমা হিসাবে এখন লোকের মুখে মুখে ফেরে। হঠাৎ করে দারুণ কিছু করে ফেলাকে রোসেটা ইভেন্ট বা রোসেটা মোমেন্ট বলে লোকেরা। সবার জীবনেই হয়ত কখনো না কখনো একটা রোসেটা মোমেন্ট আসে!

অত্যাশ্চর্য পিরামিড এবং ফারাওদের দেশ এই মিশরে একদিকে যেমন দারুণ ঐতিহ্য, ধনসম্পদ, পিরামিড ও মমি, নানান রহস্যে ঘেরা জীবন ও সংস্কৃতি, অন্যদিকে তেমনি আরেকটা ব্যাপার চলতো বেশ রমরমিয়ে। তা হলো, কবর খুঁড়ে চোরেদের নিয়মিত লুটপাট করা। মিশরের রাজাদের আর ধনী মানুষদের মৃত্যুর পর অন্তিমশয্যায় তাঁদের কফিনের মধ্যে বা চেম্বারের ভিতর সযত্নে সাজিয়ে রাখা হতো ধনসম্পদ আর তাঁদের প্রিয় জিনিসপত্র। এ ছিল এক অদ্ভুত দুনিয়া! সোনা জহরত, কতরকমের উপহার আর তার সাথে কখনো থাকতো কিছু প্যাপিরাস-এর রোল।

নীল নদের ধারে দাইয়ের আল বাহেরি কমপ্লেক্সে নতুন একটা কবর খুঁজে বার করে তা থেকে প্রচুর মূল্যবান জিনিস বের করে চালান করছিল দুই ভাই—আহমেদ এবং মহাম্মেদ আব্দ আর রসুল—দুই কুখ্যাত চোরাচালানকারি। রাশিয়ান মিশরতত্ত্ববিদ (egyptologist) গোলেনিশ্চেভ এদের একজনের কাছ থেকে একটা প্যাপিরাস রোল কিনে নিয়ে যান 1893 সালে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, এই রোলের ভিতর হয়ত কিছু অঙ্কের ব্যাপার স্যাপার আছে। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেও এই প্যাপিরাস রোলের সব লেখা বা সংকেতের মানে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। শেষে, 1912 সালে তিনি এটি দান করে দেন মস্কোর মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস-কে। এই প্যাপিরাস রোলের পুরো রহস্য উদ্ধার করতে লেগে যায় আরো প্রায় দুই দশক। শেষপর্যন্ত মিশর বিশারদ ও পন্ডিতেরা সমস্ত লেখার অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হন 1930 সালে। কী লেখা ছিল এতে? জানা গিয়েছিল, এখানে লেখা আছে নানানরকম অঙ্কের হিসাব আর ধাঁধা। মিশরীয়রা সেসময় অদ্ভুত কায়দায় ভগ্নাংশ আর দশমিকের অঙ্ক করত, যদিও ভারতীয়দের মতো শূন্যের ব্যবহার আর তার স্থানের গুরুত্ব তারা জানতো না। শূন্য আবিষ্কার হয়নি তখনো। মিশরতত্ত্ববিদদের কাছে মস্কোর মিউজিয়ামের এই প্যাপিরাস রোলের নাম "মস্কো প্যাপিরাস"। এধরণের চালান হওয়া আরো কিছু প্যাপিরাস রোল এবং নানান মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মিউজিয়ামের ইজিপ্ট গ্যালারিগুলোতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

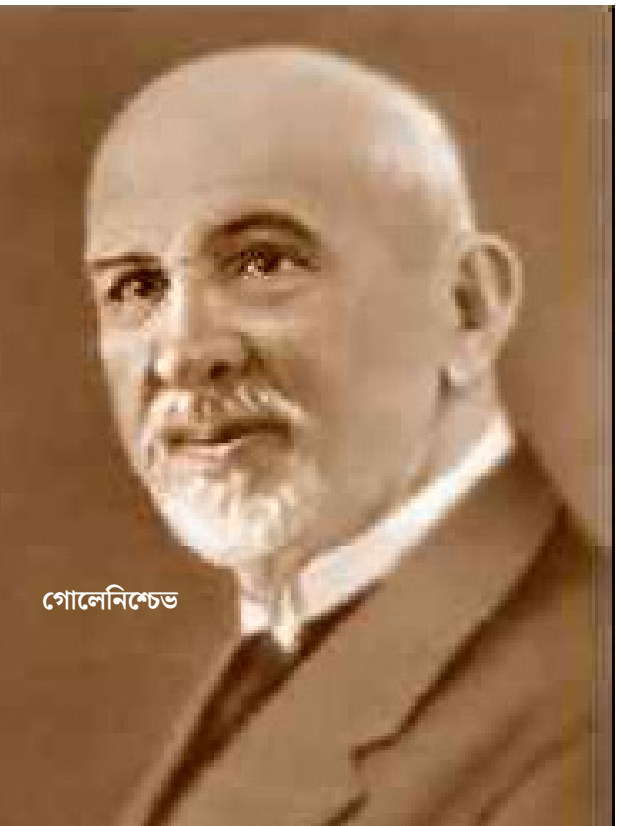
গোলেনিশ্চেভ

রোসেটা স্টোনের মতো মস্কো প্যাপিরাসের লেখার রহস্য আর অঙ্ক উদ্ধার হওয়ার পর থেকে এই নিয়ে জোরদার চর্চা শুরু হয়। এই প্যাপিরাসের 14 নম্বর অঙ্কের কথা ধরা যাক। একটা বর্গাকার ভূমিবিশিষ্ট মাথাকাটা পিরামিড। এর উপরের অংশটাও একটা বর্গক্ষেত্র হবে। অঙ্কে বলা আছে, নীচের বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 4 একক, মাথার দিকের বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 2 একক এবং ভূমি থেকে এই মাথাকাটা পিরামিডের উচ্চতা হলো 6 একক। প্রশ্ন হলো, তাহলে এর আয়তন কত হবে?

এইরকম একটা অঙ্ক তোমরা সবাই হয়ত অনায়াসে করে ফেলবে এখন। নীচের বর্গক্ষেত্রের বাহু a, উপরের বর্গক্ষেত্রের বাহু b আর এই মাথাকাটা পিরামিডের উচ্চতা h হলে এর আয়তনের ফর্মূলা হবে, $(1/3)h(a^2 + b^2 + ab)$.

খুব সহজেই এই ফর্মূলা বার করে ফেলা যায়। যেমন, পূর্ণ পিরামিডের উচ্চতা H হলে তার আয়তন হবে $(1/3)Ha^2$, আর উপরের বর্গক্ষেত্রের উপরে থাকা পিরামিডের যে অংশটা বাদ দেওয়া হয়েছে (সেটাও একটা পিরামিড) তার আয়তন $(1/3)(H - h)b^2$ হবে। এই দুটো হিসাবের বিয়োগফল থেকে পাওয়া যাবে এই মাথাকাটা পিরামিডের আয়তন। এরপর জ্যামিতিক হিসাবে H আর $(H - h)$-এর অনুপাতকে a আর b-এর অনুপাত দিয়ে লিখলেই উপরের মাথা কাটা পিরামিড (truncated pyramid)-এর আয়তনের ওই ফর্মূলাটা চলে আসবে।

তবে, প্রশ্ন হলো, মিশরীয়রা কি ওই ফর্মূলা জানতো? মস্কো প্যাপিরাস-এ থাকা ওই অঙ্কের ভাষা পড়ে অনুমান করা হয় তারা কোনোভাবে ওই ফর্মূলা জানতো। তবে, তা লেখা ছিল না কোথাও। নিশ্চয়ই তারা এইরকম ফর্মূলা ব্যবহার করে অথবা এই ধরণের কিছু আন্দাজ করে পিরামিডের মাপঝোঁক করত। কিন্তু, কিভাবে তা সম্ভব হয়েছিল তাদের পক্ষে? এখন না হয় আমরা ক্যালকুলাসের সাহায্যে পিরামিডের আয়তনের ফর্মূলা সহজেই বার করে ফেলতে পারি। কিন্তু, সেসময়ে মিশরীয়রা শুধু জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এইরকম একটা ফর্মূলা বার করে ফেলেছিলো—এটা ভাবলেই অবাক হতে হয়। এছাড়া আরো কিছু রহস্য থেকে যাচ্ছে। একটা পিরামিডের বর্গাকার ভূমির দৈর্ঘ্য সহজেই মেপে ফেলা যায়। পিরামিডের আনত তলের এক একটা ধারও মেপে নেওয়া যাবে সহজেই। কিন্তু, তা বলে উচ্চতা মাপা অথবা এইসব পরিমাপ থেকে উচ্চতার হিসাব বার করা, তা কি তখনকার দিনে সহজ কাজ ছিল?

যাই হোক, মস্কো প্যাপিরাস-এর মতো আরো অনেক গাণিতিক প্যাপিরাসের লেখা উদ্ধার করে একটা জিনিস বোঝা

গিয়েছিল যে মিশরীয়রা অঙ্কে কতটা পারদর্শী ছিল। বিশেষ করে পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোর্তিবিদ্যার হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা যে অসামান্য ছিল তা বেশ বোঝা যায়। যদিও তারা গ্রীকদের মতো অঙ্কের তত্ত্ব নিয়ে সেভাবে ভাবে নি। সিস্টেমেটিক স্টাডি করে নি। তবে, অঙ্কের বাস্তব প্রয়োগ, ট্রায়াল এন্ড এরার মেথড দিয়ে ক্যালকুলেশান করে ফেলা— এইসব ব্যাপারে যে তারা ভীষণ দক্ষ ছিল এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। গ্রীক পন্ডিত হেরোডোটাস এবং অন্য অনেকেই স্বীকার করেছেন, তাদের সভ্যতায় অঙ্কের চর্চার ক্ষেত্রে মিশরীয় সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। ভারতীয়, গ্রীস বা চৈনিক সভ্যতায় অঙ্কের চর্চা কেমন হতো অথবা তাদের অবদান কতটা ছিল এসব নিয়ে আমরা যতটা জানি সেভাবে মিশরীয় সভ্যতার এই দিকটা অবশ্য আমরা জানি না। অবশ্য, এর একটা কারণ হতে পারে, আলেক্সান্দ্রিয়ার সেই বিখ্যাত লাইব্রেরিতে ভয়ংকর আগুন লেগে প্রায় সব পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। বহু প্যপিরাস রোল তথা অমূল্য সব মিশরীয় বই, কত সমস্ত তথ্য হয়ত চিরতরেই হারিয়ে গেছে!

মস্কো প্যাপিরাস লেখা হয়েছিল আনুমানিক 1850 খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে। সেসময়ে ওই বর্গাকার পিরামিডের বাইরের মাপঝোঁক থেকে তার উচ্চতা বার করার ফর্মূলা কিভাবে মিশরীয়রা বার করলো তা জানা যায় নি। জ্যামিতি এবং ত্রিকোনোমিতির সাহায্যে করা সম্ভব কিন্তু তার স্পষ্ট প্রমাণ নেই কোথাও। কোথাও কোনো ফর্মূলা লিখে যান নি তাঁরা। সুদীর্ঘ সময় পেরিয়ে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে আলেক্সান্দ্রিয়ার হেরন (Heron of Alexandria) প্রথম ক্যালকুলেশান করে দেখালেন তাঁর Stereometria বইতে। গ্রীক গণিতজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ার বিখ্যাত এই হেরন-এর নাম আমরা অনেকেই জানি। ত্রিভুজের তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্য a, b, c দেওয়া থাকলে তা থেকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বার করার যে ফর্মূলা আমরা ব্যবহার করি তা হলো হেরন-এর ফর্মূলা। হেরন হিসাব করে দেখালেন, সেই মাথাকাটা পিরামিড-এর উচ্চতার ফর্মূলা হবে,

$$h = \sqrt{c^2 - 2\cdot\left(\frac{a-b}{2}\right)^2}$$ ।

এখানে, a এবং b হলো যথাক্রমে, মাথাকাটা পিরামিডের বর্গাকার ভূমির বাহু এবং উপরের দিকের বর্গের বাহু। আর, c হলো পিরামিডের আনত তলের একটা ধারের মাপ। হেরন a, b, c এর নানারকম মান বসিয়ে উত্তর বার করলেন। এই ফর্মূলাতে প্রথমে a = 10, b = 2, c = 9 নিয়ে দেখালেন উত্তর আসছে $h = \sqrt{49} = 7$. কিন্তু, অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটলো তাঁর পরের উদাহরণে! এবার তিনি নিলেন, a = 28, b = 4, c = 15, ফর্মূলায় বসিয়ে দেখা গেল উত্তর আসছে $\sqrt{(-63)}$ অর্থাৎ একটা নেগেটিভ সংখ্যার বর্গমূল!

হেরন

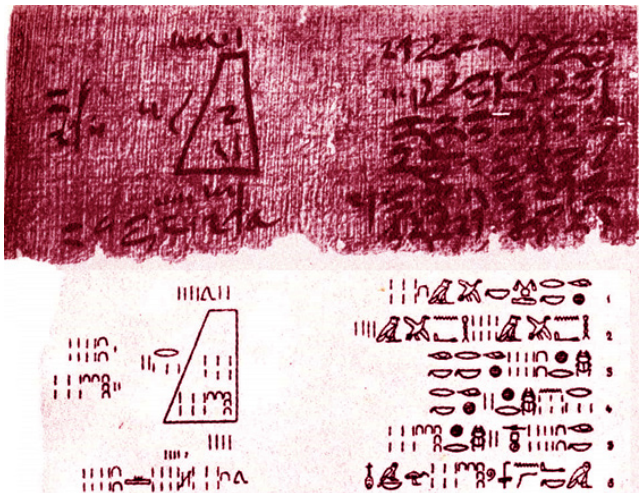

মস্কো প্যাপিরাস-এর ১৪ নং প্রবলেম। সূত্র: উইকিপিডিয়া।

অসম্ভব ব্যাপার! সত্যিই তো ঋণাত্মক কোনো সংখ্যার বর্গমূলের কি কোনো মানে হয়! তাই তিনি তাঁর বইতে লিখলেন, আসলে উত্তর হবে $\sqrt{63}$, নেগেটিভ সাইন-কে উপেক্ষা করে এরকম লিখে দিলেন তিনি। অথচ, সুদীর্ঘ সময় পেরিয়ে এখন আমরা জানি $\sqrt{(-1)}$ কে imaginary সংখ্যা ধরে জটিল সংখ্যা বা complex number-এর অঙ্ক কিভাবে করতে হয় আর কেনই বা তা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি, কমপ্লেক্স নাম্বারের অঙ্ক গণিতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। অথচ, সেইসময়ে এরকম হিসাব অবিশ্বাস্য, আজব মনে হয়েছে মানুষের, এমনকি হেরন-এর মতো গণিতজ্ঞেরও। ঠিক যেমন অমূলদ কোনো সংখ্যার অস্তিত্ব থাকতে পারে এটা পীথাগোরাসের মতো মানুষও মেনে নেন নি। অথচ তাঁর ফর্মূলা থেকেই তা এসে পড়েছিল। একটা সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন দুটি বাহু 1 একক করে হলে অতিভূজ হবে $\sqrt{2}$, এ তো পীথাগোরাসের থিওরেম থেকেই পাওয়া!

গণিতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বর্গমূল বা স্কোয়ার রুটের মধ্যে নেগেটিভ নাম্বার-এর আবির্ভাব প্রথম হতে দেখা যায় হেরনের ওই উচ্চতার ফর্মূলা থেকেই। অথচ হেরন এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের জনক হতে পারলেন না, এইরকম একটা অদ্ভুত ভাবনার পথেই হাঁটলেন না। আরো দুশো বছর পর আলেকজান্দ্রিয়ার আরেকজন স্বনামধন্য গণিতজ্ঞ ডায়োফ্যান্টাস ঠিক একইরকম সুযোগ হাতছাড়া করেছিলেন। গণিতের ইতিহাসে –1 এর স্কোয়ার রুট তথা জটিল সংখ্যার অঙ্ক তৈরি হতে সময় লেগেছিল আরো অনেক বছর! অথচ, এইরকম জটিল রাশির অঙ্ক ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিছুতেই এগোতে পারতো না। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার চর্চাই সম্ভব হতো না কমপ্লেক্স নাম্বার-এর অঙ্ক ছাড়া। তবু, হয়ত মিশরের মাথাকাটা পিরামিড-এর ওই সামান্য অঙ্ক আমাদের নিয়ে যাবে সুদূর অতীতের সভ্যতার কোন সন্ধিক্ষণে! ●

*লেখক ডঃ **অভিজিৎ কর গুপ্ত** পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: kg.abhi@gmail.com*

পুরুলিয়ায় রক অ্যাগামা

অমর কুমার নায়ক

পুরুলিয়ার পাহাড়ে চড়ব অথচ মালভূমি অঞ্চলের বিখ্যাত ‘রক অ্যাগামা’ দেখতে পাবনা এটা ভাবতেও যেন কেমন লাগে। কিন্তু খুব সহজে তার দেখা মেলেনি। আমরা পুরুলিয়া রওনা দিয়েছিলাম 29শে জুলাই। পুরুলিয়া পৌঁছে আমাদের গাইড সর্বজিতের সাথে পরিচয় পর্ব সারা হতেই সবাই নিজেদের কাঙ্ক্ষিত পাখিদের তালিকা দিয়ে দিল সাথে খেঁকশিয়াল আর হায়নার দেখা মিলবে কিনা জানতে চাইলো। আমার কোনও কিছুতেই আপত্তি নেই শুধু সংযোজিত হল রক অ্যাগামা। খেঁকশিয়াল আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত হলেও রক অ্যাগামা কিন্তু এই পুরুলিয়াত সফরেই পাওয়া সম্ভব কারণ এদের ব্যাপ্তি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের জেলাগুলিতে। তাই আমি যখন দুটো পাহাড়ের মাথায় ঘুরেও রক অ্যাগামার দেখা পেলামনা, তখন খানিকটা হতাশ হয়ে ছিলাম সেকথা বলবার অপেক্ষা রাখেনা। আগেরদিন রাত্রে যখন নাইটজারের ছবি তুলতে তুলতে বেশ রাত করে ফিরছিলাম তখন রাস্তা পার করতে দেখেছিলাম একটা লিজার্ড জাতীয় কিছুকে। সর্বজিৎকে বলতেই ও জানিয়েছিল পরেরদিন আমরা যেখানে যাব ইন্ডিয়ান ঈগল আউলের ছবি তুলতে সেখানে রক অ্যাগামার ছড়াছড়ি। তাই সেই আশাতেই ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে পাহাড়ে ওঠা। আকাশের মুখ ভার তাই দিনটা ছিল বিষণ্ণ। আর এমন দিনে তো এদের দেখা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু পুরুলিয়া এসেছি যখন তখন এদের দেখা না পেয়েই চলে যাব এমনটা ভাবতেও কেমন লাগে। তাই ঠিক করলাম সর্বজিতের সাহায্যে পাহাড়টার চূড়ায় উঠে দেখব যদি সেখানে কিছু পাই। খাড়া পাহাড়ে উঠতে কেউ রাজি হল না, তাই আমরা দুজনে চড়াই উঠতে শুরু করলাম। কিছুটা উঠে বুঝলাম উপর উঠতে যতটা কষ্ট তার চেয়ে বেশি শক্ত নামা। এখানে পথ বানিয়ে ওঠা আর সহজ পথ খুঁজে নীচে নামা এই আমাদের নিয়ম। অনেকটা উপরে উঠে দেখা পেলাম রক ঈগল আউলটার। সে নিশ্চিন্ত মনে একটা গাছের ডালে পাতার আড়ালে মুখ ঢেকে বসে আসছে। বেশ কয়েকটা ছবি নিয়ে ফেরার চিন্তা করছি। এমন সময় মেঘ সরে গিয়ে আলো ফুটল, আর সেই সঙ্গে একটা বড় পাথরের মাথার উপরে একটা রক অ্যাগামা এসে রোদ পোহানোর ভঙ্গিমায় শুয়ে পড়ল। দূরে পাহাড়গুলো নিয়ে একটা হ্যাবিট্যাট তুললাম খানিকটা রিস্ক নিয়ে। নীচে ফিরে আসবার পর রোদ বাড়তেই সবকটা পাথরের চূড়ায় ‘রক অ্যাগামা’ এসে রোদ পোহাতে লাগল। আলোর ঝলকে তাদের গায়ের উজ্জ্বল লাল রং আরও ঝলমল করতে লাগল। পাথুরে পাহাড়ের চারদিকে ঈগল আউল হায়না আর রক অ্যাগামার উপস্থিতি আমাদের পুরুলিয়া সফরকে সত্যিই সার্থক করে তুলেছে। এই গিরগিটি

জাতীয় প্রাণীটি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বীরভূম ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায় এবং উত্তরবঙ্গে অনুপস্থিত তাই একে দেখার এত সাধ আমাদের।

অ্যাগামিড পরিবারের স্যামোফিলাস গণের অন্তর্গত এই প্রজাতিটির বিজ্ঞান সম্মত নাম *Psammophilus blanfordanus* আর বাংলা নাম পাথুরে গিরগিটি। এদের বাসস্থানের সাথে এই নাম সম্পূর্ণরূপে মিলে যায়। এদের সমতল থেকে 1500 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত দেখা যায়। মাঝারি থেকে বেশ বড় আকারের এই গিরগিটি গুলোর দেহ বেশ শক্ত সমর্থ এবং চ্যাপ্টা প্রকৃতির। মাথা থেকে দেহের দৈর্ঘ্য 14 সেমি. এবং লেজ 29 সেমি. লম্বা হয়। পুরুষদের তুলনায় স্ত্রী'রা একটু ছোট আকারের হয়। এদের গলার সামনে একধরণের ভাঁজ দেখা যায় চামড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, জয়চন্ডি পাহাড় এবং সংলগ্ন পাথুরে অঞ্চলে এদের বেশ ভালো সংখ্যায় পাওয়া যায়। পাথুরে পাহাড়ের উপর ঘুরে বেড়ানো এই গিরগিটি গুলির পূর্ণাঙ্গ পুরুষ প্রজাতির সারাদেহে ধূসর বাদামি বর্ণের হয় এবং তার উপর গাঢ় বাদামি বা কালো রঙের সরু পটি দেখা যায়। পেটের দিকের রং হলদে হয়। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী এবং শৈশবে এদের গায়ের রং, পারিপার্শ্বিক পরিবেশে মিশে থাকতে সাহায্য করে। স্ত্রী এবং শৈশব অবস্থায় এদের গায়ের রং জলপাই-বাদামির উপর গাঢ় বাদামি ছোপ এবং ছোট ছোট দাগ যুক্ত হয়। পিঠের দিকে সারিবদ্ধ দাগ থাকে। প্রজনন কালে পূর্ণাঙ্গ পুরুষেরা দেখতে বেশ আকর্ষক হয়। এই সময় মাথা ও ঘাড়ের রং উজ্জ্বল লাল বা কমলা হয় এবং নাসারুন্ধ্র থেকে চোখ হয়ে ঘাড় অবধি মোটা কালো পটি দেখা যায়। এই সময় এদের গলা থেকে দেহতল কালো রঙের হয়ে যায়। স্ত্রী-দের ক্ষেত্রে এই ধরণের কোনও পরিবর্তন দেখা যায়না। এরা বেশ সতর্ক থাকে এবং সামান্য বিপদের আভাস পেলেই পাথুরে অঞ্চলের খাঁজে লুকিয়ে যায়। এরা দিনের দিকে সক্রিয় থাকে এবং পুরুষেরা এলাকা দখলে তৎপর থাকে। এরা ঘন ঘন মাথা উপরে নীচে করতে করতে এলাকায় তদারকি করে থাকে। এরা বেশিরভাগ সময় পাথরের উপরে শুয়ে রোদ পোহায়। একে বাস্কিং বলে, এর মাধ্যমে এরা দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখে। পাথরের খাঁজে গর্তের মধ্যে ঠাণ্ডায় থাকার জন্য সূর্যের আলোর থেকে যতটা সম্ভব তাপ শরীরে নিয়ে নেয় যাতে প্রয়োজনীয় তাপের ঘাতটি পূরণ হয়। এদের মূল খাদ্য যে

এলাকায় বাস করে সেখানে যেসব পোকামাকড় পাওয়া যায় সেসব। প্রজননের সময় মে থেকে জুন মাস। এই সময় এরা একসাথে সাত থেকে আটটি ডিম পাড়ে একবারে। ডিমগুলি পাথরের খাঁজে পেড়ে রাখে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া খুব কাছাকাছি ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যা রাজ্যে এদের পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা IUCN এর লাল তালিকা অনুযায়ী এরা বিপদ মুক্ত তালিকায় আছে এবং এদের সংখ্যা (বিশ্বব্যাপী) স্থিতিশীল। পশ্চিমবঙ্গের অযোধ্যা পাহাড় ছাড়াও জয়চণ্ডী পাহাড়, শুশুনিয়া পাহাড়, বিহারিনাথ পাহাড়, বাঘমুন্ডি, মুকুটমণিপুর, খাতরা, বিষ্ণুপুর, রাণিবাঁধ, ঝিলমিল, মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে এদের বেশ ভালো সংখ্যায় পাওয়া যায়। বর্তমানে তেমন কোনও অসুবিধা না থাকলেও আবাস্থলের কাছাকাছি অঞ্চলে মানুষের অতিসক্রিয়তা ভবিষ্যতে এদের জন্য বাসস্থান জনিত সমস্যা, খাদ্যের ঘাটতি এবং প্রজননে বাধা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

*লেখক **শ্রী অমর কুমার নায়ক** একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: amarnayak.stat@gmail.com*

গবেষণায় স্বপ্রণোদিত নিয়ন্ত্রণ: এসিলোমার প্রস্তাব

সিদ্ধার্থ রায়

বিজ্ঞানিরা সত্য উদ্ঘাটনের জন্যই গবেষণা করেন, পরবর্তীকালে সেই গবেষণার ফল কি হবে সেটা সাধারণত তাদের বিচার্য বিষয় নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে মধ্যযুগীয় ইউরোপে, ধর্মযাজকরা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় হস্তক্ষেপ করেছেন যখন তাদের আবিষ্কার ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে গেছে বা যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানে এরূপ হস্তক্ষেপের অতিপরিচিত উদাহরণ পোপ কর্তৃক গ্যালিলিওর পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণার সমর্থনকে প্রত্যাহার করানোর ঘটনায়।

বিজ্ঞানী তার গবেষণার ফলের বিপদজনক পরিস্থিতির সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে সেই গবেষণা থেকে বিরত থাকার ঘটনা অতি বিরল। সেইরকম এক বিরল ঘটনা ঘটেছিল 1975 খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যালিফোর্ণিয়ার এসিলোমার সভাগৃহে, বিজ্ঞানীদের এক সভায়। এখানে তারা জিন উপাদানের পুনর্মিলন (বিজ্ঞানের ভাষায় রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ) সংক্রান্ত গবেষণার সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে নিজেরাই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন কিভাবে এই ধরণের গবেষণায় লাগাম পড়ানো উচিৎ।

উক্ত বিজ্ঞানসভা এবং প্রস্তাবটির সম্বন্ধে কিছু বলার আগে গবেষণার বিষয়টি সম্বন্ধে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশকে মটরশুঁটি নিয়ে গ্রেগর মেন্ডেলের পরীক্ষালব্ধ বিখ্যাত বংশগতি সূত্রের মাধ্যমে জীববিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে উদ্ভিদ তথা প্রাণিদের কোষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বংশগতির রহস্য। পরবর্তীতে বহু বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন যে জীবকোষের মধ্যে ডিএনএ নামক যে অতি বৃহৎ জৈব অণুগুলি রয়েছে তাদের মধ্যেই অবস্থান করছে "জিন" নামক অংশগুলি। জিনগুলিই বহন করে জীবন ধারণের জন্য যাবতীয় সংকেত বা নির্দেশ, যার সাহায্যে এরা যেমন নিজেদের প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে তেমনি জীবটির বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং বংশবিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম পদার্থ (অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন) তৈরি করে। কোষ মধ্যস্থ এই জিনগুলিই স্থির করে সেই জীবের দৈহিক গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

1950 সালের মধ্যে বিজ্ঞানীরা বৃহৎ ডিএনএ অণু কি কি ক্ষুদ্রতর অণু নিয়ে গঠিত হয় তার হদিস পেয়েছিলেন। 1953 সালে ইংরাজ পদার্থবিদ্ ফ্রান্সিস ক্রিক এবং আমেরিকান প্রাণরসায়নবিদ্ জেম্‌স ওয়াটসন অপর দুই বিজ্ঞানী মরিস উইলকিন্স এবং রোসালিন্ড ফ্র্যাংকলিনের জিনের এক্স-রশ্মি চিত্র নিয়ে গবেষণার উপর ভিত্তি করে ডিএনএ অণুর দ্বিকুন্ডলী বিশিষ্ট

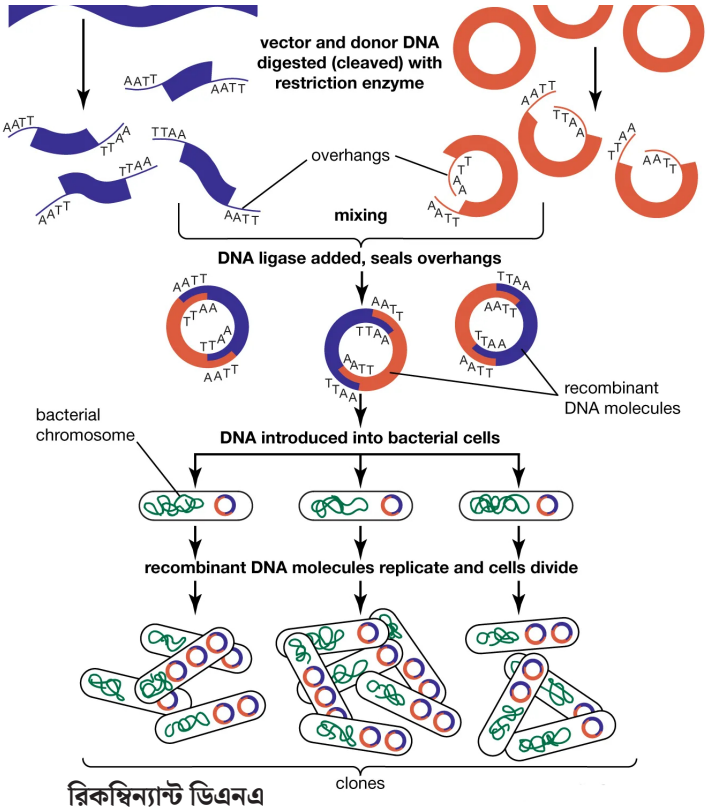

গঠনটি আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। এই আবিষ্কারের জন্য প্রথম তিন বিজ্ঞানী 1962 সালে চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীরবৃত্ত বিভাগের নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। দুঃখের কথা, রোসালিন্ড তার আগেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছিলেন।

ডিএনএ অণুর গঠন বোঝার পর সেই অণুর মধ্যে জিনগুলি কিভাবে বিভিন্ন প্রোটিন সৃষ্টি করে সেই রহস্য ভেদ করতে বিজ্ঞানীরা সমর্থ হলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান সেখানেই শেষ হল না। জিন সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাদের কাছে দেখা দিলঃ (১) একটিমাত্র ভ্রূণকোষের (যার সৃষ্টি হয় মাতা ও পিতার জননকোষের মিলনে) থেকে কিভাবে একটি বহুকোষী জটিল জীবের সৃষ্টি হয়, এবং (২) ভ্রূণকোষটি কিভাবে বুঝতে পারে সেটি কি জীব হতে চলেছে। এড লিউইস, নুসলিন ভোলার্ড, সিডনি ব্রেনার, জন সালস্টন এবং আরো অনেক জিন বিজ্ঞানীর গবেষণার মাধ্যমে সেই প্রশ্নেরও উত্তর মিলেছিল। তাদের গবেষণার সারমর্ম হল—জীবদেহের প্রতিটি কোষ তাদের কোষমধ্যস্থ জিনের থেকে নির্দেশ পায় তাদের কি ধরনের কোষ হতে হবে (পূর্ণ বয়স্ক একটি মানব দেহ কমবেশি 200 ধরনের মোট আনুমানিক 30 লক্ষ কোটি কোষ দিয়ে গড়ে ওঠে) এবং কখন কোন স্থানে সৃষ্টি হতে হবে! অর্থাৎ ক্ষুদ্র কীট থেকে শুরু করে বৃহৎ জটিল দেহ বিশিষ্ট প্রাণীর অঙ্গ সংস্থানের সবটাই জিনের এক নিখুঁত শিল্পকর্ম। কিছু জিন আছে যারা কেবল নির্দিষ্ট কিছু প্রোটিন সৃষ্টি করে, কিন্তু অন্য বহু জিনের (মানুষের দেহে আছে বিশ হাজারেরও বেশি জিন) বিভিন্ন সমবায়ে সম্ভব হয় অঙ্গ সংস্থান এবং শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন ধরনের জটিলতা।

জিনের কর্মকৌশল আবিষ্কার করেই যদি সন্তুষ্ট হতেন বিজ্ঞানীরা তবে সমস্যা ছিল না। তারা বিভিন্ন জিনকে সনাক্ত করতে এবং ডিএনএ অণু থেকে তাদের আলাদা করতে সমর্থ

এসিলোমার সভাগৃহ

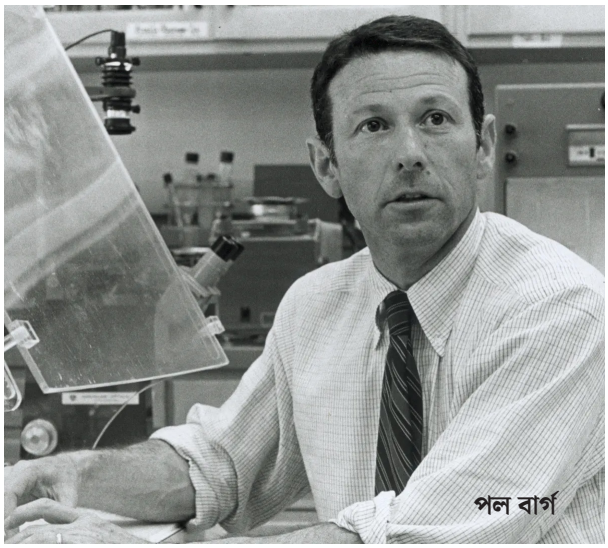

পল বার্গ

হবার পর শুরু করলেন ভিন্ন দুটি প্রাণীর জিন জুড়ে দিয়ে সেটি অন্য কোনো প্রাণীর কোষের সঙ্গে যুক্ত করলে কি হয় তার অনুসন্ধান। এই ধরনের গবেষণাকে বলে জিন প্রযুক্তি। 1971 সালে প্রাণরসায়নবিদ্ পল বার্গ এবং তার সহযোগী ও ছাত্ররা মিলে এসভি40 নামের একটি ভাইরাসের পুরো ডিএনএ এর সঙ্গে অপর একটি ভাইরাসের ডিএনএ এর কিয়দংশ জুড়তে সমর্থ হলেন, তৈরি হল মানুষের তৈরি এক নতুন ডিএনএ। এদের পরিকল্পনা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে এই কৃত্রিম ডিএনএ এর অংশটিকে ই. *কোলি* নামক একটি ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করানো, এবং তার মাধ্যমে সেই কৃত্রিম ডিএনএ অংশটির বহু ক্লোন কপি সৃষ্টি করা। বার্গ এই ভাবে সৃষ্টি করা নতুন ডিএনএ এর নাম দেন "রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ"। বলা বাহুল্য, বার্গের এরূপ সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক বিজ্ঞানী আরম্ভ করেছিল বিভিন্ন জীবাণু এবং প্রাণীর ডিএনএ জুড়ে বিভিন্ন নতুন রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ তৈরি করার পরীক্ষা।

1971 সালে একটি বিজ্ঞান সভায় বার্গ এবং তার সহযোগীদের কৃত্রিম জিন সৃষ্টি সংক্রান্ত বক্তৃতার শেষে এই জাতীয় গবেষণার নিরাপত্তা নিয়ে কথা উঠল—কিভাবে বার্গ বা অন্য বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়তা দেবেন যে তাদের সৃষ্ট নতুন জিন যুক্ত অণুজীবেরা মানুষ অথবা অন্য প্রাণিদের মধ্যে কোনো জীববিজ্ঞানীয় বিপর্যয় ঘটাবেনা? সভার শেষে বার্গ ও তার সহযোগীরা অনেক রাত জেগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন জিন প্রযুক্তির ভবিষ্যত এবং তার সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে।

এরপর বার্গ 1973 সালের জানুয়ারি মাসে ক্যালিফোর্ণিয়ার "এসিলোমার" সভাগৃহে জিন প্রযুক্তি বিষয়ে একটি বিজ্ঞানসভার আয়োজন করেন যেখানে যোগ দিয়েছিলেন অনেক জিনতত্ত্ববিদ্, জীবাণুতত্ত্ববিদ্, ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা। এসিলোমারে অনুষ্ঠিত প্রথম এই সভার আলোচনা সৃষ্টি করেছিল অশেষ উত্তেজনা, আলোচনা হয়েছিল এই গবেষণায় গবেষকদের নিরাপত্তা নিয়েও, কিন্তু সভার শেষে বিশেষ কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। জিন প্রযুক্তি নিয়ে বরং তৈরি হয়েছিল বেশি করে আগ্রহ।

বাল্টিমোর

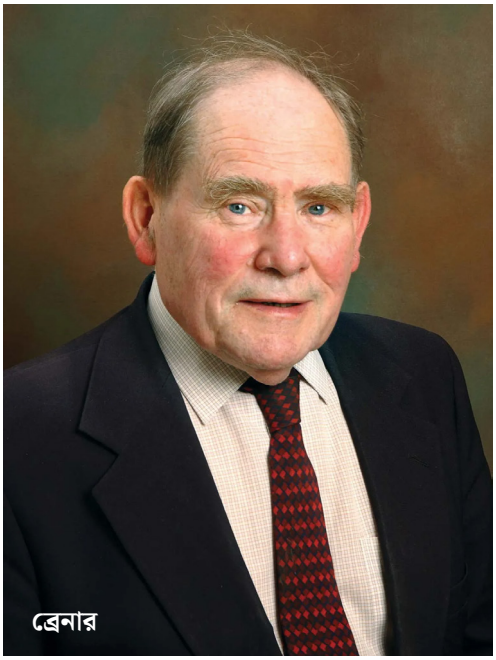
ব্রেনার

সিঙ্গার

এমত অবস্থায় বহু আলোচনার পর পাঁচজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বার্গ, বাল্টিমোর, ব্রেনার, রবলিন এবং সিঙ্গার মিলে 1975 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজন করেছিলেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম ব্যাতিক্রমী এক সভার, সেই একই সভাগৃহে, যেটি "দ্বিতীয় এসিলোমার" আলোচনা সভা নামে পরিচিত। এই সভার অন্যতম বিশেষত্ব সেখানে বিজ্ঞানী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একদল আইনজ্ঞ, সাংবাদিক এবং বিজ্ঞান লেখকরা। সভার প্রথম বক্তা ছিলেন বার্গ স্বয়ং। তিনি বলেন জিন প্রযুক্তিবিদ্যা এখন এমন সহজ হয়ে গেছে যে একজন অনভিজ্ঞ জীবিবিজ্ঞানীও গবেষণাগারে কৃত্রিম জিন তৈরি করে ক্লোন করতে সমর্থ হবেন। সামান্য অসতর্কতার ফলে স্তন্যপায়ী প্রাণির মধ্যে সেই কৃত্রিম জিন প্রবেশের মাধ্যমে যে প্রচন্ড বিপদ ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে বক্তব্যের পর তিনি এই জাতীয় গবেষণায় ইতি টানার কথাও বলেন। বলা বাহুল্য, এর পর শুরু হয়েছিল প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক। আইনজ্ঞরা স্মরণ করান যে এরূপ গবেষণার ফল স্বরূপ যদি মারাত্মক কোনো দুর্যোগ ঘটে তবে সরকারী হস্তক্ষেপে জিন গবেষণাই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সভার অন্তিম দিনের আগের রাত জেগে পাঁচ উদ্যোক্তারা তৈরি করেন একটি প্রস্তাবপত্র।

জিন প্রযুক্তির সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য এই প্রস্তাবপত্রে বিপদের মাত্রা অনুসারে জিন গবেষণাগুলিকে চারভাগে বিভক্ত করা এবং সেই অনুসারে কিভাবে গবেষণাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ তার প্রস্তাবনা করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ক্যানসার ঘটাতে পারে এমন জিনকে ভাইরাসে অনুপ্রবেশ করানো সবচেয়ে বিপদজনক, তাই এই ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে নিতে হবে চরম সতর্কতা। অপরপক্ষে ব্যাঙ জাতীয় নিম্নতর প্রাণীর জিনকে কোনো ব্যাক্টেরিয়ায় প্রবেশ করানো জাতীয় গবেষণা সবচেয়ে কম বিপদজনক, সুতরাং সে ক্ষেত্রে সতর্কতার মাত্রা হতে পারে অনেকটা কম। শেষের দিন সকালে যখন সভা শুরু হয়েছিল, প্রস্তাবক পাঁচ সদস্য মোটেই নিশ্চিত ছিলেন না সেই প্রস্তাব গৃহিত হওয়ার ব্যাপারে। বিস্ময়জনকভাবে প্রস্তাবটি প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়েছিল।

জিন প্রযুক্তির সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য এই প্রস্তাবপত্রে বিপদের মাত্রা অনুসারে জিন গবেষণাগুলিকে চারভাগে বিভক্ত করা এবং সেই অনুসারে কিভাবে গবেষণাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ তার প্রস্তাবনা করা হয়।

দ্বিতীয় এসিলোমার সভায় গৃহিত প্রস্তাবটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দলিল, যেখানে বিজ্ঞানিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। যদিও এর পর জিন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা মোটেও থেমে থাকেনি, কিন্তু পৃথিবী জুড়ে জিন প্রযুক্তির গবেষণা সংক্রান্ত নানাবিধ বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। এ বছর প্রথম এসিলোমার সভার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। ●

লেখক ***ড. সিদ্ধার্থ রায়*** *এন.আই.টি.টি.টি.আর, কোলকাতার প্রাক্তন অধ্যাপক ও নির্দেশক এবং লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: raysiddhartha@yahoo.com

যারা আলো জ্বেলেছিল (পর্ব – ১০)

অরুণাভ দত্ত

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের অগ্রগতি সমানুপাতিক। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে ততই বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, সভ্যতার স্বরূপ। শুরুটা হয়েছিল বেঁচে থাকার লড়াই দিয়ে। সে লড়াই আজও থামেনি। চলছে পৃথিবীর অবর্তমানে অন্য গ্রহে মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস। গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ থেকে অ্যাপোলো 11, দ্রুততার সঙ্গে মানুষ পৌঁছেছে উন্নতির শিখরে এবং বিজ্ঞানের এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাঁদের জন্যই যাঁরা অন্ধকার পৃথিবীর বুকে প্রথম বিজ্ঞানের আলো জ্বেলেছিল।

ব্রুনোকে যখন হত্যা করা হয়, তখন গ্যালিলিওর বয়স 36। কোপারনিকাসের তত্ত্ব তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। কোপারনিকাসের মৃত্যুর প্রায় 75 বছর পর কার্ডিনাল বেল্লারমিন বললেন, ‘পরীক্ষা করে দেখাতে না পারলে পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এ কথা বিশ্বাস করা যাবে না।’ সঙ্গে সঙ্গে গ্যালিলিও এগিয়ে এসে অকাট্য যুক্তি দিলেন, পৃথিবীতে জোয়ার ভাটার কারণ খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু গির্জা অতশত বোঝেনি। তাদের চাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এ কথা সত্যি যে, কোপারনিকাস, ব্রুনো এঁরা কেউই গির্জার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো উপযুক্ত প্রমাণ রেখে যাননি। এমন সময় 1608 খ্রিস্টাব্দে হ্যানস্ লিপার্শে আবিষ্কার করলেন দূরবিনের আদিম রূপ ‘লুকার’। দূরের জিনিস কাছে আসছে! খবরটা পেয়ে গ্যালিলিওর আনন্দ আর ধরে না! যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন। তিনি আলোর ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ঘষা কাচ দিয়ে উত্তল ও অবতল লেন্স বানালেন। তার পর একটা চোঙের দু দিকে লেন্স দুটো বসিয়ে তৈরি করলেন তৈরি করলেন দূরবিন। বহু দূরের কোনও মহাজাগতিক বস্তু মানুষের নয়নপথে স্পষ্টভাবে ধরা দিল।

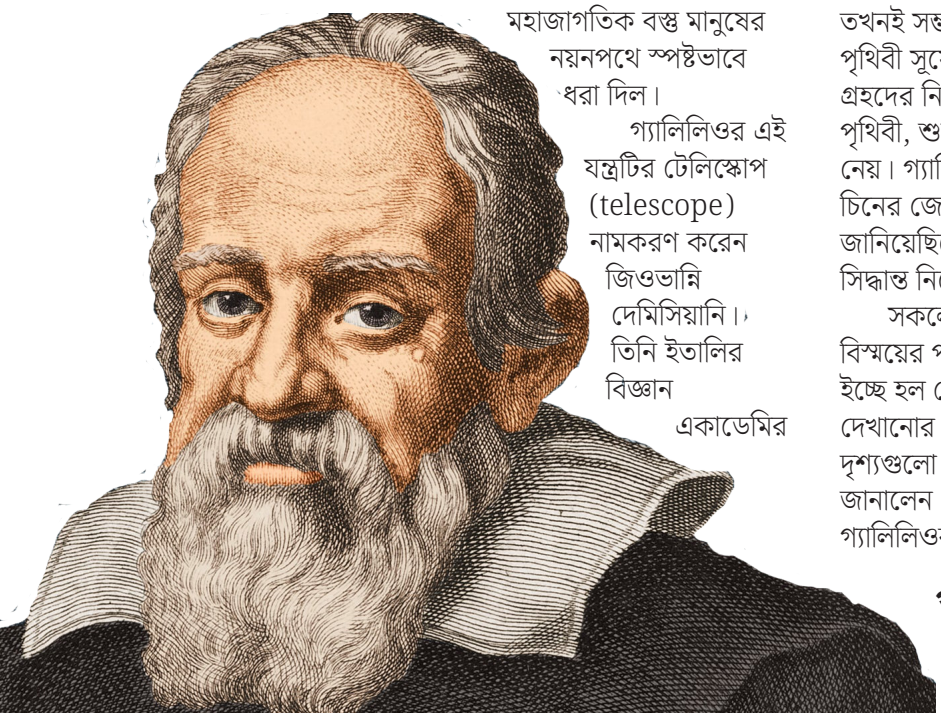

গ্যালিলিও

গ্যালিলিওর এই যন্ত্রটির টেলিস্কোপ (telescope) নামকরণ করেন জিওভান্নি দেমিসিয়ানি। তিনি ইতালির বিজ্ঞান একাডেমির সভ্য ছিলেন। গ্রিক ‘tele’ কথার অর্থ ‘দূর’ এবং ‘skopein’ মানে দেখা। কেমন করে কাজ করে দূরবিন? দূরবিনের লেন্সে যাকে আমরা দেখব তার গা থেকে এসে আলো পড়ে। সে আলো লেন্সের তল ছুঁয়ে আমাদের চোখে পৌঁছয়। তাই আমরা দেখি।

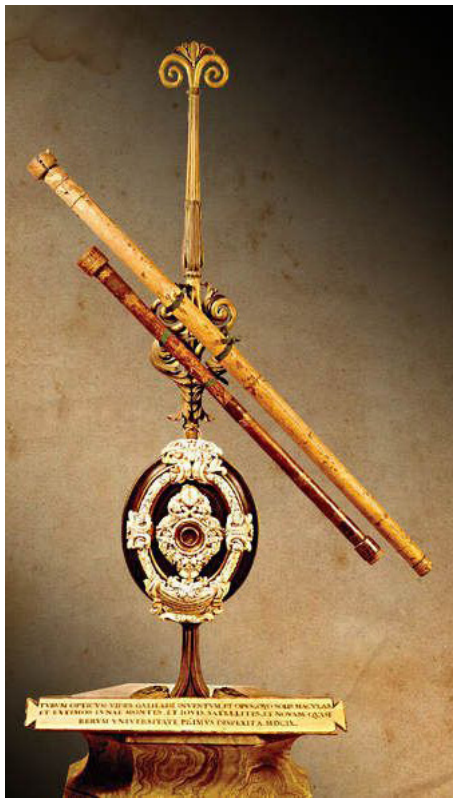

গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ

জানা যায়, 1609-এর শেষ থেকে 1610 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত গ্যালিলিও দূরবিনে চোখ রেখে মহাকাশ পর্যবেক্ষণে বুঁদ হয়ে ছিলেন। সত্যের উপর থেকে সমস্ত আবরণ সরে গেল। কোপারনিকাস যা সত্য বলে মানতেন, ব্রুনো যে সত্যের জন্য প্রাণ দিলেন, সেই সত্য গ্যালিলিওর কাছে স্পষ্ট রূপে ধরা দিল। তিনি দেখলেন চাঁদে অসংখ্য পাহাড় আছে। অতএব অ্যারিস্টটলের ‘চাঁদ একটি নিখুঁত গোলক’ ধারণার খুঁত বেরিয়ে গেল। গ্যালিলিও আরও দেখলেন, বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ বৃহস্পতির চারদিকে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে, নীহারিকা আসলে কতগুলো তারার সমষ্টি। লক্ষ্য করলেন শুক্র গ্রহের বিভিন্ন দশা। পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় চাঁদের চেহারা যেমন বদলায়, তেমনি শুক্রের আকৃতিও বদলে যায়। এমন পরিবর্তন তখনই সম্ভব হয়, যদি শুক্র সূর্যের চারদিকে ঘোরে। অর্থাৎ শুধু পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে না। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, গ্রহদের নিজস্ব আলো আছে। সে ধারণাও ভুল প্রমাণিত হল। পৃথিবী, শুক্র, চাঁদ সকলেই সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার নেয়। গ্যালিলিও দেখলেন, সূর্যের গায়ে কলঙ্ক আছে। যদিও চিনের জ্যোতির্বিদরা বহু শতাব্দী আগে সৌরকলঙ্কের কথা জানিয়েছিলেন। সেই কলঙ্কগুলোকে গতিশীল দেখে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সূর্যও নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে।

সকলেই ঘুরছে! কেউ ক্ষণকাল তিষ্ঠোতে পারছে না। বিস্ময়ের পর বিস্ময় এসে গ্যালিলিওকে অস্থির করে তুলল। তাঁর ইচ্ছে হল যে, এমন সব আশ্চর্যকর দৃশ্য সকলকে ডেকে ডেকে দেখানোর। সুতরাং গ্যালিলিও তাঁর দূরবিনের সাহায্যে মহাকাশের দৃশ্যগুলো চাক্ষুষ করবার জন্য বিশিষ্ট পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানালেন। অনেকেই তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে গ্যালিলিওর বন্ধুস্থানীয়রা প্রতিদিন রাত্রে গ্যালিলিওর কাছে এসে

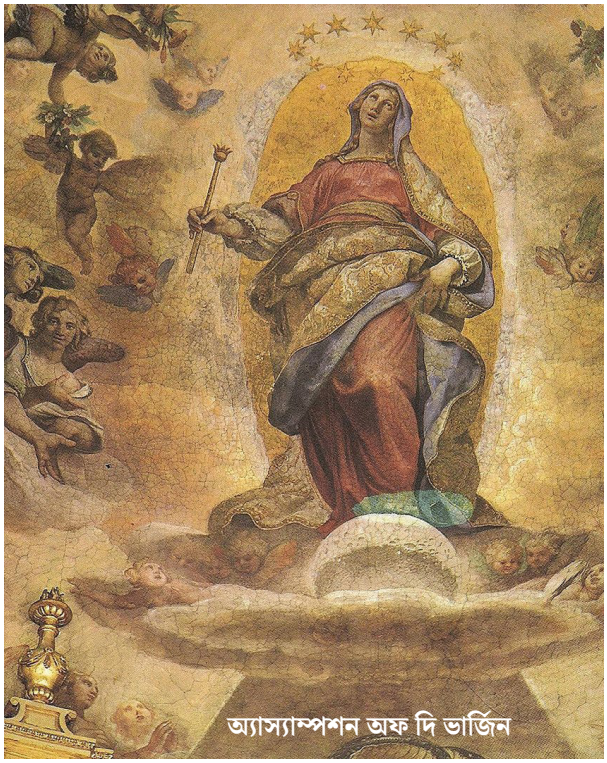
অ্যাস্যাম্পশন অফ দি ভার্জিন

গ্যালিলিওর বিচার

তাঁর দূরবিনে চোখ রাখতেন, চাক্ষুষ করতেন মহাকাশের সমস্ত বিস্ময়। গ্যালিলিও কিন্তু এখানেই থেমে রইলেন না। সত্যের আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য 1610 খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখে ফেললেন ‘সিডেরিয়াস নানসিয়াস’ নামে একটি বই। সেই বইতে তিনি অ্যারিস্টটলের বিরোধিতা করে কোপারনিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন জানালেন। প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরলেন নিজের দূরবিনে দেখা মহাকাশের সমস্ত বিবরণ। যাজকরা বুঝতে পারলেন, ব্রুনোকে হত্যা করেও পৃথিবীকে থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সে ঘুরছে। কিন্তু এই খবর জনসাধারণের কানে গেলে সর্বনাশ! কারণ গ্যালিলিও তো শুধু মুখে বলছেন না, একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। ফলে বাইবেল আর অ্যারিস্টটলের উপর বিশ্বাস রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লুডোভিগ কার্ডি (1559–1613) ছিলেন গ্যালিলিওর বন্ধু। 1612 খ্রিস্টাব্দে লুডোভিগ ‘অ্যাস্যাম্পশন অফ দি ভার্জিন’ ছবিটি আঁকলেন। এই ছবির বিশেষত্ব হল, ম্যাডোনার পায়ের তলায় চাঁদের ছবিটা। গ্যালিলিও তাঁর দূরবিনে চাঁদের যেমন চেহারা দেখেছিলেন, ছবিতে ঠিক তেমনভাবেই চাঁদ এঁকেছিলেন লুডোভিগ। এই লুডোভিগ পরবর্তীকালে গ্যালিলিওর বিরোধীদের ‘পায়রা দলের লীগ’ বলে উপহাস করতেন। কারণ পায়রা যেমন খোপের বাইরে কোথাও যেতে চায় না, তেমনই এরা স্থির পৃথিবী থেকে চলমান পৃথিবীতে যেতে চায় না। লুডোভিগ তাঁর বন্ধু গ্যালিলিওকে সতর্ক করেছিলেন যে, ‘পৃথিবী ঘুরছে’ এই খবর যাতে প্রচার না হয়, সেইজন্য একদল মানুষ জোট বাঁধছে।

এই ছবির বিশেষত্ব হল, ম্যাডোনার পায়ের তলায় চাঁদের ছবিটা। গ্যালিলিও তাঁর দূরবিনে চাঁদের যেমন চেহারা দেখেছিলেন, ছবিতে ঠিক তেমনভাবেই চাঁদ এঁকেছিলেন লুডোভিগ।

গ্যালিলিওর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ বেঁধেছিল গোঁড়া টম্মাসো ক্যাসিনির। 1614 খ্রিস্টাব্দের 20 ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করলেন ‘গণিত ও পদার্থবিদ্যা যে কথা বলে, বাইবেল তা বলে না। যারা এসবের চর্চা করেন তারা অপরাধী। গ্যালিলিও ও তাঁর অনুগামীরা স্বর্গের পথে কাঁটা হয়ে ঘুরছেন।’ 1615 খ্রিস্টাব্দে ক্যাসিনি রোমের বিচারসভায় গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। সেই বছরের শেষে গ্যালিলিওকে অসুস্থ শরীর নিয়ে রোমের বিচারসভায় গিয়ে দাঁড়াতে হল। বিচারসভার প্রধান গ্যালিলিওকে আদেশ দিলেন, ‘কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক ধারণা যে ভুল সে কথা স্বীকার করুন। এই ধারণার সপক্ষে আপনি যা যা বলেছেন, তা ফিরিয়ে নিন।’

গ্যালিলিও নিজের মতবাদ ফিরিয়ে নিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন যে, নানা রকম চাপ দিয়ে তাঁকে এমন কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছে। 1616 খ্রিস্টাব্দে গির্জা ঘোষণা করল, ‘কোপারনিকাসের দর্শনের উপর বই লেখা এবং এ জাতীয় কোনও বই নিজের কাছে রাখা, দুটোই সমান অপরাধ।’

1623 খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিওর বন্ধু পোপ হলেন। অনেক আশা নিয়ে গ্যালিলিও পোপের কাছে গেলেন গির্জার নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য। তিনি আংশিক সফলতা পেলেন। পোপ নির্দেশ দিলেন, ‘অ্যারিস্টটল ও কোপারনিকাস, দুজনের দর্শন পাশাপাশি রেখে বিচারকমণ্ডলীর অনুমতিক্রমে বই প্রকাশ করা যাবে।’ এর পর 1632 সাল। প্রকাশিত হল বিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম সেরা বই, গ্যালিলিওর লেখা ‘ডায়ালগ কনসার্নিং দি টু চিফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস’। সংক্ষেপে ‘ডায়ালগ’। এই বই লেখা হয় তিনটি কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে। তিনটি চরিত্র হল—

কোপারনিকাসের অনুরাগী সালভিয়াতি, অ্যারিস্টটলের ভক্ত সিম্পলিসিও এবং একজন নিরপেক্ষ ও মুক্তমনের পণ্ডিত সাগরেদো। গ্যালিলিওর এই বই লেখার উদ্দেশ্য ছিল, গির্জার রক্তচক্ষু এড়িয়ে তিনটি মানুষের কথপোকথনের মাধ্যমে কোপার্নিকাসের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। পাঠকরা এই বই পড়ে বুঝতে পারলেন যে, সালভিয়াতি চরিত্রটি আসলে গ্যালিলিও নিজে। এ ছাড়া সিম্পলিসিও হল গির্জা আর সাগরেদো হল নিরপেক্ষ শ্রোতা। বইয়ের শেষে আছে সালভিয়াতি ও সাগরেদোর অকাট্য যুক্তির কাছে হার মানছেন অ্যারিস্টটলের ভক্ত সিম্পলিসিও।

মজার বিষয় হল, এই বইতে মহাকাশের কথা বলতে বলতে গ্যালিলিও বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরও একটি আলো জ্বালিয়ে ফেলেন। আমরা জানি আপেক্ষিকতার জন্ম অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের (1879–1955) হাতে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'ডায়ালগ' বইতে কথপোকথনের ছলে আপেক্ষিক গতির আভাস দিয়েছিলেন গ্যালিলিও। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোনও সমবেগে গতিশীল বস্তুর মধ্যে থেকে বস্তুর গতি বোঝা যাবে না। পালতোলা জাহাজের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেন গ্যালিলিও। একটি চলমান জাহাজে পালের ডগাটি ওই জাহাজের কোনও যাত্রীর কাছে গতিহীন স্থির মনে হবে। ওই যাত্রীর কাছে কিছুতেই প্রমাণ করা যাবে না পালের ডগাটির গতি। জাহাজ চললে পালের ডগাটির সমান গতি থাকবে, কিন্তু তা যাত্রীর চোখে ধরা পড়বে না। এটাই ছিল গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতার সারকথা। পৃথিবী স্থির নেই, সেও যে অন্যান্য গ্রহের মতো সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এই সহজ ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি না কেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে আপেক্ষিকতার প্রসঙ্গে তোলেন গ্যালিলিও। বলেন ওই পালতোলা জাহাজের গল্প। অর্থাৎ আইনস্টাইনের জন্মের প্রায় 275 বছর আগেই গ্যালিলিও আপেক্ষিকতার কথা বলে গিয়েছেন।

নিন্দুকেরা বইটি পড়ে তৎকালীন পোপকে গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন। গ্যালিলিওর বই নিষিদ্ধ হল। রোমে বসল নতুন বিচারসভা। তাঁকে আবার যেতে হল বিচারসভায়। এর আগে তাঁকে সতর্ক করেও লাভ হয়নি। যাজকরা বুঝলেন গ্যালিলিও নাছোড়বান্দা। যে কোনও মূল্যে তিনি তাঁর নিজের মতামত জাহির করবেনই। সেই সময় বিচারক ছিলেন গ্যালিলিওর বন্ধু। 1633 খ্রিস্টাব্দের 22 জুন তাঁর বিচারের রায় বেরোল। 'ডায়ালগ' বাতিল হল। গ্যালিলিও আমৃত্যু গৃহবন্দি হলেন। সেইসঙ্গে ঘোষণা করা হল যে, কোপারনিকাসের মতবাদ ভুল এ কথা গ্যালিলিওকে আবার স্বীকার করতে হবে।

নিরুপায় গ্যালিলিও দ্বিতীয়বার পোপের নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তার পর গ্যালিলিওর অনুতাপ হল, 'আমি সত্যকে অস্বীকার করলাম!' সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে পদাঘাত করে বললেন, 'তবু পৃথিবী ঘুরছে'। নিভে যেতে যেতে ফের জ্বলে উঠলেন গ্যালিলিও। ফলস্বরূপ গ্যালিলিওকে আমৃত্যু গৃহবন্দি থাকতে হল। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। কিন্তু হারাননি জ্ঞানের আলো বিতরণের অদম্য উৎসাহ। মৃত্যুর আগে গ্যালিলিওর আরও একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি সকলের অগোচরে হল্যান্ডের এক প্রকাশকের কাছে পৌঁছয়। ওই বইতে তিনি স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার প্রয়োগে অ্যারিস্টটলের ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে সমূলে উপড়ে ফেলেছিলেন। 1638 খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির নাম 'টু নিউ সায়েন্স' (two new sciences)।

ব্রুনোর স্মৃতিস্তম্ভ

তবে অন্ধকার তো চিরদিন থাকে না। অতএব আলো ফুটল পৃথিবীর আকাশে। গ্যালিলিওর মৃত্যুর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলে 1758 খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক গির্জা ঘোষণা করল, 'কেউ যদি সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের কথা বলে বই প্রকাশ করতে চান, তাতে গির্জার আপত্তি নেই।' গির্জার যে নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা আছে, সেখানে কোপারনিকাসের 'দি রিভুলিউশন' ও গ্যালিলিওর 'ডায়ালগ' বই দুটির নাম ছিল। 1835 সালে গির্জা বই দুটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। 2000 সালে পোপ দ্বিতীয় জন পল জানিয়েছেন যে, বিগত দু'হাজার বছর ধরে গির্জার বিচারসভা তার ইতিহাসে যত ভুল বিচার করেছে, তার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি সেই বিবৃতিতে গ্যালিলিওর বিচারের কথাও বলেছেন। পৃথিবী ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছে সত্যান্বেষী জিওর্দানো ব্রুনোর কাছেও। ব্রুনোর মৃত্যুর প্রায় 290 বছর পরে নবজাগরণের ভিত্তিভূমি ইতালির বোধোদয় হয় যে, ব্রুনোর প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। রোমে যেখানে ব্রুনোকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল, সেখানে 1889 সালে স্থাপন করা হয়েছে ব্রুনোর স্মৃতিস্তম্ভ।

তার পর গ্যালিলিওর অনুতাপ হল, 'আমি সত্যকে অস্বীকার করলাম!' সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে পদাঘাত করে বললেন, 'তবু পৃথিবী ঘুরছে'।

আর্যভট্ট, কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও—বিজ্ঞানের ইতিহাসে চার অনন্য সত্যান্বেষী। দেশ, কাল আলাদা হলেও চারজনের স্বপ্ন ছিল একই, জ্ঞানের আলোয় পৃথিবীকে আলোকিত করা। বলা ভাল, তাঁরা সূর্যের মতোই পুড়ে যেতে যেতে পৃথিবীকে আলো দিয়ে গিয়েছেন। ●

লেখক ***শ্রী অরুণাভ দত্ত*** *জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক এবং বিজ্ঞানকর্মী। ইমেল: wrarunabha18@gmail.com*

ওরা জলে চড়ে তাই জলপিপি

তাপস কুমার দত্ত

পৃথিবীতে এমন কিছু পাখি আছে যাদের আকৃতি, রঙ আমাদের সবাইকে আকৃষ্ট করে তোলে। পশ্চিমবঙ্গের জেলা উত্তর ২৪ পরগনার হালিসহর স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলের এমন কিছু জলা জায়গা আছে যেখানে একটা সময়ে অনেক ধরনের পাখির দেখা পাওয়া যেতো। হয়তো আজও তাদের দেখা পাওয়া যায় কিন্তু তারা আজ সংখ্যাতে অনেকটাই কম। একটা পাখির কথা আমার বার বার খুব মনে পড়ে, যার পিঠের দিকের রঙ ব্রোঞ্জের মতো, তারপর নীল আভা এবং ঠোঁটের অংশতে বিভিন্ন রঙের বাহার। আমাদের ছোটোবেলাতে আমাদের বিজ্ঞান বইয়ের মলাটে এই পাখির ছবি প্রায়ই দেখা যেতো। পরবর্তী কালে পাখির ছবি তুলতে গিয়ে এই পাখির সাথে আমার পরিচয় হয়। এই পাখিকে বাংলাতে জলপিপি আবার অনেকে এই পাখিকে দলপিপিও বলে থাকেন। তবে জলপিপি নামটিই বেশী প্রচলিত। ইংরাজীতে এই পাখির নাম হলো ব্রোঞ্জ ওয়িং জ্যাকানা। এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো *মেটোপিডিয়াস ইন্ডিকাস* (*Metopidius indicus*)। পৃথিবীর বিশাল এলাকা জুড়ে এই জাতীয় পাখিদের বসবাস। বিগত শতকের তুলনায় এদের সংখ্যা কমেছে কি বেড়েছে সেরকম পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই। সেই কারনে আই.ইউ.সি.এন এই প্রজাতির পাখিকে নূন্যতম বিপদগ্রস্ত হিসাবে ধরে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এরা যে বিপদে পড়বেনা এই কথা আমরা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারিনা। এই পাখি ভারত ও আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের একটি স্থায়ী পাখি। যে সমস্ত খাল, বিল, পুকুর, জলাশয়, জলাভূমি আছে সেই সব জায়গাতে এরা অবাধে বিচরন করে থাকে।

এদের গড়ন অনেকটা ডাহুক পাখির মতো হলেও ডাহুকের সাথে এদের অনেকটাই পার্থক্য আছে। জলপিপির পা দুটি বেশ বড়ো হয়ে থাকে এবং পায়ের আঙুলের তুলনায় অনেকটাই লম্বা হয়ে থাকে। এই রকম পায়ের গড়ন হওয়ার জন্য জলে ভাসমান গাছের পাতার উপর দিয়ে এরা খুব সহজেই হাঁটাচলা ও দ্রুত বেগে দৌঁড়াতে পারে যা অন্য কোনো জলচর পাখির ক্ষেত্রে সম্ভব হয়না। এরা কিন্তু খুব একটা ভালোভাবে উড়তে পারেনা। উড়ার সময়ে এরা এদের পা দুটি ঝুলিয়ে এবং মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে উড়তেই পছন্দ করে। একটা বিষয় খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছি যে এরা সব সময় জোড়ায় জোড়ায় বিচরন করতে ভালোবাসে। প্রজনন কালের সময় আসলে তখন এদের ডাকাডাকির স্বর খুব বেশী শোনা যায় এবং এই সময়ে এরা পি – পি – পি – পি সুরে সারাক্ষন ডাকতেই থাকে। এই ভাবেই ডাকে বলে এবং জলে বিচরন করে বলে এদের বাংলাতে নামকরনটি হয়তো এই জন্যই জলপিপি হয়েছে। ডাহুক পাখির ডাকে যেমন সুর তাল নেই তেমনি এদের ডাকেও খুব একটা সুর তাল নেই বললেই চলে। ডাক অনেকটাই কর্কশ হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময়ে এদের ডাক সিক্ – সিক্ – সিক্ ঠিক যেন ঘড়ির এলার্ম দেওয়ার শব্দের মতোও মনে হয়।

যদি আমরা ভালো করে একটু পর্যবেক্ষন করি তবে আমরা দেখবো পুরুষ পাখির তুলনায় স্ত্রী পাখি আকার সামান্য বড়ো হয়ে থাকে। পুরুষ পাখি লম্বায় প্রায় 29 সেমি এবং স্ত্রী পাখি 32 সেমি লম্বা হয়। এই পাখির ওজন 155 গ্রামের মতো হয় থাকে। এই পাখির ঘার, গলা, বুক ও মাথা উজ্জ্বল নীলাভ কালো রঙের হয়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির ডানা ও পিঠের দিকে অংশ সবুজাভ ব্রোঞ্জ রঙের হয়ে থাকে। চোখের উপরের দিক থেকে সাদা রঙের লম্বা দাগটি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এদের লেজ আকারে অনেকটাই ছোটো হয়ে থাকে। ঠোঁটটি সবুজাভ হলুদ রঙের এবং ঠোঁটের গোড়াতে সামান্য লাল ছোপ চিহ্ন থাকে। পা দুটি আকারে অনেকটাই লম্বা এবং ময়লা সবুজ বর্নের হয়। স্ত্রী ও পুরুষের ভেদাভেদ খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

বেশীভাগ সময়ে এদেরকে জলের কাছাকাছি কাদামাটি ও জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিচরন করতে দেখা যায়। কোনো কোনো সময়ে আবার দেখা যায় এরা জলের মধ্যে যে জলজ উদ্ভিদ থাকে সেখানে সেই পাতার উপর দিয়ে অতি সহজেই হাঁটাহাঁটি এবং দ্রুত গতিতে দৌঁড়াতে পারে। এই পাখি খুব একটা ভালো করে উড়তে পারেনা। জলের ধারে যেহেতু এরা ঘুরে বেড়ায় তাই এরা জলজ পোকামাকড় শিকার করে খাদ্য হিসাবে তাই গ্রহন করে। এছাড়া এদের খাদ্য তালিকাতে আছে ঘাসের বীজ, জলজ উদ্ভিদের কান্ড, কন্দ,

পরিণত ও শিশু জলপিপি

মূল ও জলজ উদ্ভিদের কচি পাতা, আবার শামুক, কেঁচো,লার্ভা, মাকড়সা ইত্যাদি। এদের প্রজননের সময় হলো বর্ষাকালের জুন থেকে আগষ্টের মধ্যে। খুব ভালো করে যদি আমরা এদেরকে পর্যবেক্ষন করি তবে দেখতে পাবো এরা জলের উপরই বাসা বাঁধে এবং এই বাসা তারা ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উপর পানা এবং ঘাসপাতা দিয়ে তৈরী করে থাকে। আরো একটি মজার বিষয় হলো যে প্রজনন কালে একটি স্ত্রী পাখি একাধিক পুরুষ পাখির সাথে মিলিত হতে পারে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে এরা আলাদা আলাদা বাসাতে ডিম পেড়ে থাকে। বাসা বানানো হয়ে গেলে সেই বাসাতে 4 থেকে 6 টি করে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর স্ত্রী পাখি কিন্তু ডিমে তা দেয়না, ডিমে তা দেওয়ার কাজটি করে থাকে পুরুষ পাখি। তা দেওয়ার পর সেই ডিম 18 থেকে 20 দিনের মাথায় ফুটে নতুন জলপিপি পাখির জন্ম হয়। শৈশব কালে এই ছোটো পাখি তাদের মা ও বাবার সাথে থেকে খাদ্যের জন্য জলাশয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে। তবে এদের পুরুষ পাখিরা বাচ্ছা ছানাদের বড়ো করা ও পরিচর্যা করে থাকে। ছোটো অবস্থাতে এদের গায়ের পিঠের দিকের অংশ হালকা বাদামী এবং পেটের দিকের রঙ সাদা হয়ে থাকে।

আজ আমাদের পরিবেশের যেটার সব থেকে বেশী অভাব সেটা হলো জলাভূমি। নগরায়নের জন্য জলাভূমির জায়গা অনেকটাই আজ কমে গেছে। জল ও জলের কাছাকাছি যে সমস্ত পাখিরা চড়ে বেড়ায় জলাভূমি কমে যাওয়ার জন্য এদের বিচরন করার জায়গাটাও আজ অনেকটা কম। যতো যেন দিন যাচ্ছে ততই যেন এই সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। ফলে আজ এই পাখিরা আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে এক গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে। এই অবস্থা থেকে যদি এরা মুক্তি না পায় তবে একদিন এদের অস্তিত্ব বজায় রাখা বড়ই কঠিন হয়ে পড়বে। এদের আগামী ভবিষ্যত যদি ভালো করতে হয় তবে নতুন করে আর কোনো জলাভূমি বোঝানো চলবেনা। যে সমস্ত জলাভূমি আছে তাদের সংরক্ষন করাটাই সব থেকে জরুরী কাজ। এই জলাভূমি সংরক্ষনের মধ্য দিয়ে হয়তো আমরা জলপিপি পাখিদের বাঁচাতে পারবো। শুধু জলপিপি নয় তার সাথে অন্যান্য জলে চরা পাখিরাও বেঁচে যাবে। আমাদের এদেরকে নিয়ে ভাববার সময় এসে গেছে আর দেরী করা ঠিক হবেনা। এই রকম একটি ভালো কাজে আজ সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক ***শ্রী তাপস কুমার দত্ত*** *বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: tapashkumardutta.2012@gmail.com*

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও ইতিহাসের উন্মুক্তি

শীর্ষেন্দু গায়েন

পৃথিবীতে জীবজগতের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন গ্রিন হাউস গ্যাস সমূহের। গ্রিন হাউস গ্যাস না থাকলে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়াত –18 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেখানে বর্তমান গড় তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণের ফলে বাড়ছে পৃথিবীর উষ্ণতা।

গ্রিন হাউস হল কাঁচ, প্লাসটিক বা স্বচ্ছ পলিমার দিয়ে তৈরি একটি ঘর, শীতপ্রধান দেশে যেখানে শাক-সব্জী, ফুল-ফল ও বিভিন্ন উদ্ভিদের চাষ করা হয়। এ ধরনের ঘরের দেওয়াল আগত সূর্য রশ্মির তাপ ঢুকতে দিলেও, ঘর থেকে বেরতে দেয় না। ফলে ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার জন্য শীতপ্রধান দেশে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও প্রয়োজনীয় সবরকমের শাক-সব্জী ও ফল-ফুলের চাষ স্বম্ভব হয়। ভিতরের সবুজ গাছ-পালার জন্যই এর নাম গ্রিন হাউস। গ্রীনহাউস গ্যাসগুলি এইরকমই একটা আবরণ তৈরী করেছে পৃথিবীর ওপর যা পৃথিবীর তাপ বিকিরণকে আটকে দেয়।

'বিশ্ব উষ্ণায়ন' আজকের দিনে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। এক কথায় বলতে গেলে, ক্রমাগত পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিকেই বিশ্ব উষ্ণায়ন বলে। আপাত নিরীহ এই শব্দটি-ই হয়ত বর্তমানে ও আগামীদিনে মানবজাতির সবথেকে বড় বিপদের সংকেতবহ। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, অরণ্যনিধন, যথেচ্ছভাবে শক্তি উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার সহ মনুষ্যসৃষ্ট আরও নানা কারণে বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, শিল্প থেকে নির্গত গ্যাস, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ওজন ইত্যাদি) মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গ্যাসগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপের একটা অংশ শোষণ করে নিয়ে প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে তুলছে পৃথিবীর উষ্ণতা। আর এ ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর ভূমিকাই অগ্রগণ্য, যদিও তাদের জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 20%। সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যান থেকে একথা স্পষ্ট যে, গত শতাব্দীতে যেখানে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল 0.74 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্তমান শতাব্দীতে তা বাড়ার সম্ভাবনা 1.1–6.64 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যায়, 1.5 থেকে 2.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর 20–30% প্রজাতির জীবন বিপন্ন হতে পারে।

আমরা যদি শুধু ফেলে আসা বছরটার দিকে তাকাই, বুঝতে পারব, 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' মানবজাতির কাছে কতটা ভয়ংকর। বিগত বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহ আগের সমস্ত রেকর্ডকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। দিল্লির 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট'-এর দেওয়া একটা পরিসংখ্যান দেখলে আতঙ্কিত হতেই হয়। 2021 সালে চরম আবহাওয়াজনিত মোট মৃত্যু 6134 জনের, মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমান 15 হাজার 240 মার্কিন ডলার ও বিপন্ন মানুষের সংখ্যা 6.44 কোটি। প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে নানান সতর্কবার্তা সত্ত্বেও, মানুষের অপরিণামদর্শিতার জন্য, পরিবেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর পরিমান। দূষিত হচ্ছে পরিবেশ, বাড়ছে পৃথিবীর উষ্ণতা। অস্বাভাবিক হারে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন মেরু অঞ্চল সহ বিভিন্ন হিমবাহের বরফ গলে জলের তলায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া সহ বেশ কিছু দেশের, তেমনি আবার আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে দেখা দিতে পারে দুর্ভিক্ষ। এমনকি চরম খরার কবলে পড়ে বেরিয়ে পড়ছে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস।

সম্রাট নিরো'র আমলে তৈরি পাথরের সেতুর ধ্বংসাবশেষ

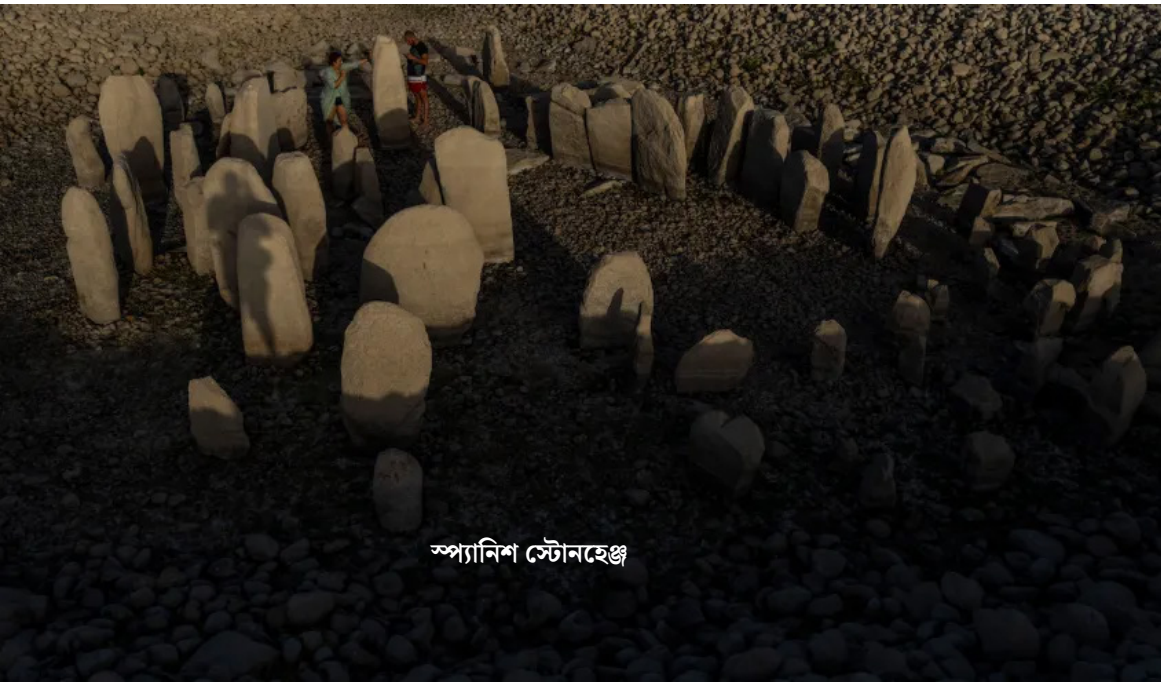
স্প্যানিশ স্টোনহেঞ্জ

• কলোরাডো নদীর ওপর হুভার বাঁধ দ্বারা গঠিত বৃহত্তম জলাধার ‘লেক মিড’। এটি আমেরিকায় অ্যারিজোনা এবং নেভাডা-র সীমানায় অবস্থিত। 2022-র 5-ই সেপ্টেম্বর এই জলাধারের মাত্র 28% অংশ জুড়ে জল ছিল। জলস্তর এতটাই নেমে যায় যে, মে থেকে আগস্টের মধ্যে প্রায় পাঁচবার এখানে সুদূর অতীতে চাপাপড়া মানুষের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। এই লেক-ই ক্যালফোর্নিয়া, মেক্সিকো-র একাংশ, অ্যারিজোনা এবং নেভাডার প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয় জলের উৎস।

মাটিচাপা ইতিহাস

• 2022-র জুলাই মাস। শুকিয়ে যায় ইতালির পো ও টাইবার নদীর জল। টাইবার নদীতে দেখতে পাওয়া যায় সম্রাট নিরো’র আমলে তৈরি পাথরের সেতুর ধ্বংসাবশেষ। পো নদীর চরে দেখা মেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার, 450 কিলোগ্রাম ওজনের না-ফাটা এক বোমা।

• আজ থেকে প্রায় 600 বছর আগে চিনের ইয়াংসি নদী তীরবর্তী দ্বীপ ছিল ফোয়েলিয়াং। সময়টা মিং এবং কুইং রাজত্বের। আগস্টে চরম খরায় ইয়াংসি নদীর বুকে দেখতে পাওয়া যায় এই দ্বীপের তিনটি বুদ্ধমূর্তি।

• স্পেনের ভালদেকানাস জলাধার। ফেলে আসা বছরে পুরোটাই শুকিয়ে যায়। আমরা চাক্ষুষ করি খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় 5000 বছর আগে গড়ে ওঠা স্প্যানিশ স্টোনহেঞ্জ। যার পরিচিতি ‘ডলমেন অফ গুয়াদালপেরাল’ নামে।

• খ্রিস্টপূর্ব 1550–1350 সময়টা মিত্তানি রাজত্বের। ওই সময় গড়ে ওঠে জাখিকুয়ান নগর। ইরাকের যে অঞ্চলে এই নগর গড়ে উঠেছিল, তা আজ কুর্দিস্তান নামে পরিচিত। এখানেই মসুল জলাধারের জলস্তর ভয়াবহ খরার কবলে পড়ে এতটাই নেমে যায় যে, দেখতে পাওয়া যায় জাখিকুয়ান নগরের ধ্বংসাবশেষ।

• 2022-র জুলাই-আগস্ট মাসে এলবে নদীর জলস্তর নেমে যাওয়ায় চেকপ্রজাতন্ত্রের ভেসিনে দেখতে পাওয়া যায় তথাকথিত “হাঙ্গার স্টোন” (খুদিত পাষাণ)। পাথরটিতে কয়েক শতাব্দী আগে জার্মান ভাষায় খোদাই করা হয়েছিল, “ওয়েন ডু মিচ সিয়েস্ট, ড্যান ওয়েইন”।

• এবছর-ই ইউরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী দানিউবের জলস্তর গত শতাব্দীর মধ্যে সব থেকে কম হয়। জলস্তর নেমে যাওয়ায় বন্দর শহর প্রাহোভোর কাছে, স্থানীয়রা কয়েক ডজন নাৎসি যুদ্ধজাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। উদ্বেগ ছড়ায় জাহাজগুলিতে কোনও না ফাটা গোলাবারুদ আছে, এই ভেবে।

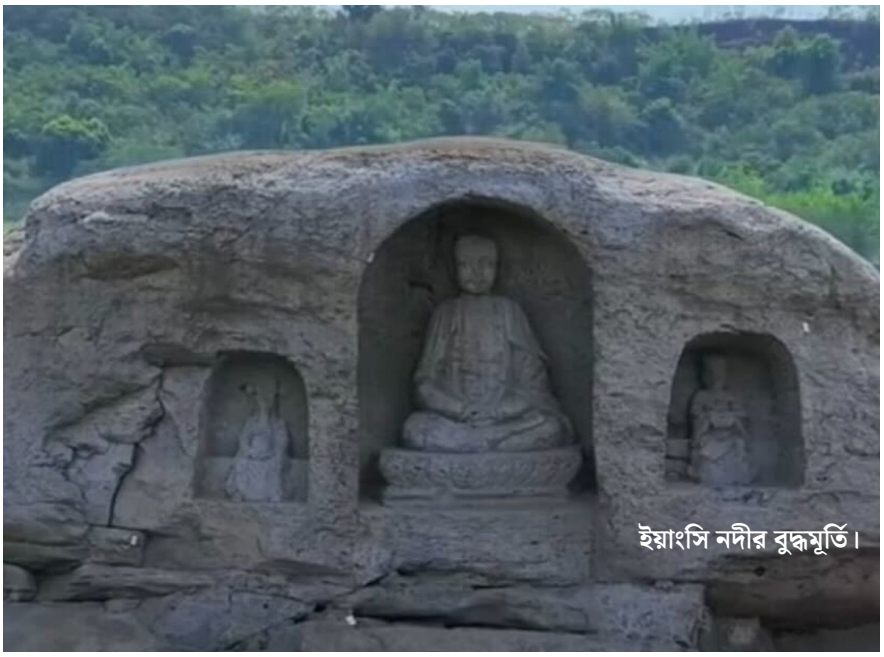
ইয়াংসি নদীর বুদ্ধমূর্তি।

হাঙ্গার স্টোন

পরিবেশ ধ্বংসের খেলায় মেতেছি আমরা। সতর্ক করতে 1974 সালের 5-ই জুনকে ঘোষণা করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস রূপে। থামানো যায়নি আমাদের। একে একে 1987 সালে ব্রান্ডট্‌ল্যান্ড কমিশন ও মন্ট্রিয়ল চুক্তি, 1992 সালে রিয়োডিজেনিরো-র বসুন্ধরা সম্মেলন, 1997 সালে কিয়েটো প্রটোকল, 2002 সালে জোহানেসবার্গ সম্মেলন, 2015-র প্যারিস চুক্তি, 2020 সালে কোপেনহেগেন শপথ, 2021-এ স্কটল্যান্ডে সিওপি-26, 2022-এ মিশরের শারম অল শেখ সিওপি-27—বিশ্বব্যাপী নানান প্রচেষ্টা হয়েই চলেছে আমাদেরকে পরিবেশ সচেতন করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রচেষ্টার ফল মিলেছে খুব সামান্যই। প্রকৃতির সহনশীলতার লক্ষণরেখা অতিক্রম করেছি আমরা। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা তারই উদাহরন। আর সময় নেই আমাদের হাতে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে বিজ্ঞানী ক্রিস ব্রাইট এর উক্তি—'নেচার হ্যাজ নো রিসেট বাটনস'। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটা সুস্থ-সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে চাইলে, আমাদের প্রত্যেককে মনে-প্রানে বিশ্বাস করতে হবে কবির উক্তি—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর, ...

*লেখক **শ্রী শীর্ষেন্দু গায়েন** ঠাকুরপুকুর, কলকাতার বিবেকানন্দ কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: sgayensrci@gmail.com*

দানিউবে নাৎসি যুদ্বজাহাজের ধ্বংসাবশেষ

আশ্চর্য ব্রহ্মান্ড

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

আমাদের প্রত্যেকের ছোটবেলা কেটেছে মায়ের কোলে শুয়ে চাঁদ মামার ঘুমপাড়ানি গান শুনে; তারপর ছড়ার বইয়ে টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার পড়ে মনের মাঝে জেগেছে কতই না স্বপ্ন: ওই সীমাহীন আকাশ নিয়ে। তাকে নিয়ে জানার ইচ্ছে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে রহস্য। সেই আশ্চর্য ব্রহ্মান্ডের কিছু বিস্ময় আজ আমাদের সামনে উন্মোচিত।

এনার্জি বুস্টার নীহারিকা

আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা কতৃক প্রতিদিন মহাশূন্যের নানা সব চিত্র সংগ্রহ করা হয় গবেষণার স্বার্থে। তেমনই 24শে এপ্রিলের দিনের সেরা ছবিটি হলো কিম্বার্লি সিব্বাল্ডের তোলা মেডুলা নেবুলার ছবি। যার নাম সি টি বি-1। সি টি বি-1 হল প্রায় 10000 বছর আগে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে ধাবিত একটি বৃহৎ তারার বিস্ফোটকের ফলে উৎপন্ন বিস্তৃত গ্যাস পিন্ড। নক্ষত্রটিতে সম্ভবত তার কোয়ান্টাম ফিউজনের জন্য পর্যাপ্ত কেন্দ্রস্থ স্থিতিশীল চাপ অবর্তমান ছিল। ফলস্বরূপ মস্তিষ্কের মতো দেখতে মেডুলা নেবুলা নামে একটি উজ্জ্বল সুপারনোভা অবস্থান করছে মহাশূন্যে। আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের সাথে বিক্রিয়াশীল এই সুপারনোভা টি দৃশ্যমান আলোতে জ্বলজ্বল করে। এটিই সি টি বি-1 নামে পরিচিত। তবে এই নেবুলাটি কেন একইভাবে এক্স-রশ্মি তেও জ্বলজ্বল করে, তা এখনও একটি রহস্য। তবে একটি অনুসিদ্ধান্তে মনে করা হয় যে, প্রায় চাঁদের সমান দেখতে এই মেডুলা নেবুলা টির মধ্যে বহির্মুখী প্রবাহিত একটি দ্রুত বাতাসের সাথে অদ্ভুত এক ধরনের শক্তি উৎপাদিত হয়। এইজন্যই এই নীহারিকাটিকে এনার্জি বুস্টার নীহারিকাও বলা হয়ে থাকে।

এনার্জি বুস্টার নীহারিকা

মঙ্গলে এত সমতল পাথর কেন

জ্যোতির্বিদ্যার নিরন্তর গবেষণায় রত ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা কতৃক প্রদত্ত গত 2রা মে রোজের সেরা ছবিটি হলো মঙ্গল গ্রহের সমতল পাথরের ভূমিচিত্র। এই ছবিতে দেখা যায় মঙ্গল গ্রহের সমতল ভূমি এবং পাহাড়ের কিছু দৃশ্য যেগুলি পৃথিবীর পাথরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে সমতল। বিজ্ঞানী মহলে এই নিয়েই যত জল্পনা! এর কারণ হল একটি প্রক্রিয়া যা মঙ্গল গ্রহ এবং পৃথিবী উভয়ের জন্যই সাধারণ—ক্ষয়। মঙ্গল গ্রহে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-পৃক্ত বাতাস স্যান্ডপেপারের মতো কাজ করে যখন এটি মঙ্গল গ্রহে উপস্থিত বালিকে উড়িয়ে অন্যত্র বহন করে। এই বালি তারতম্য অনুযায়ী ক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে, কিছু শিলাকে মসৃণ করে এবং অন্যান্য দীর্ঘ-উন্মুক্ত পাথরের শীর্ষগুলিকে বালি দিয়ে ঢেকে সমতল বানিয়ে দেয়। এই সমতল শিলা দ্বারা আবৃত বেশ কয়েকটি পাহাড়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্রটি গত মাসে মঙ্গল গ্রহে কর্মরত নাসা-এর কিউরিসিটি রোভার দ্বারা নেওয়া হয়েছিল। এই রোবোটিক রোভারটি দশ বছর ধরে মঙ্গল গ্রহে ঘুরছে এবং পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহের অতীত জলহাওয়া বিষয়ে অনেক বিবরণ উন্মোচন করতে সাহায্য করছে। এই ছবিটি এবং অন্যান্য ছবি তোলার পর, কিউরিসিটি রোভার মার্কার ব্যান্ড ভ্যালিতে ওঠার জন্য পাথর এবং পিচ্ছিল বালি সাবধানে পরিদর্শন করে চলেছে। আশা করা যায় আগামীদিনে মহাকাশ সম্বন্ধে আরও রোমাঞ্চকর তথ্য আমাদের সামনে আসবে !

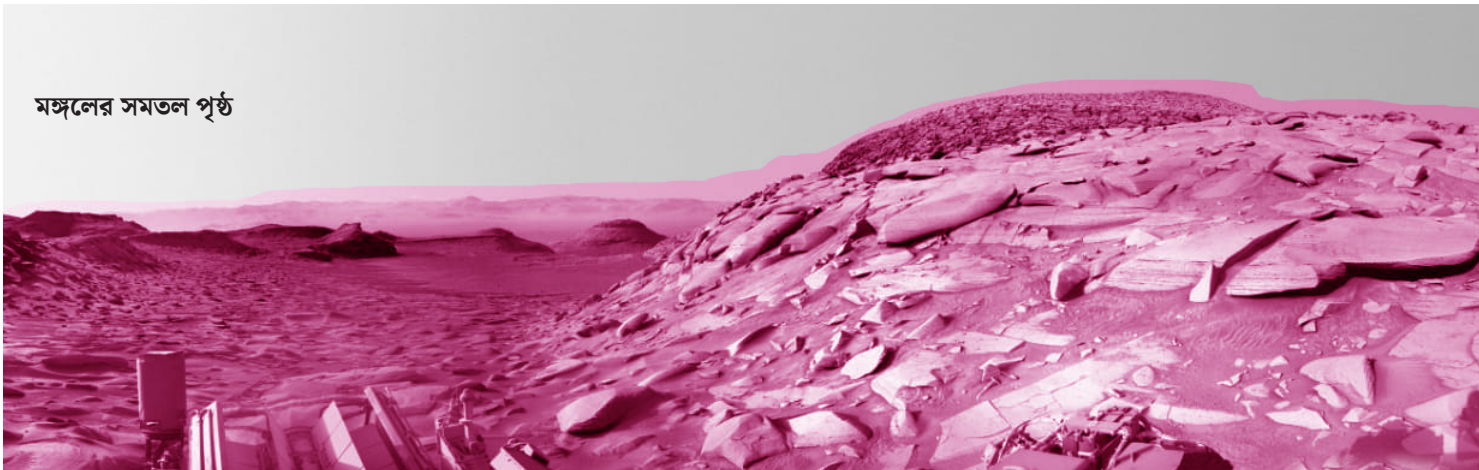
মঙ্গলের সমতল পৃষ্ঠ

নক্ষত্রের এক অদ্ভুত দ্বীপ

হররোজ ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উন্মোচন করতে এবং জ্যোতির্বিদ্যার ভান্ডার ভরাট করতে আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা মহাকাশ পানে চেয়ে থাকে সর্বক্ষণ। ফলস্বরূপ আমাদের সামনে আসে মহাশূন্যের বিচিত্র সব আলোকচিত্র। গত 3রা মে আমাদের সামনে এমনই একটি ছবি এসে পৌঁছেছে—"সেন্টাওরাস এ"। ছবিটি সংগ্রহ করেছেন মহাকাশ আলোকচিত্রগ্রাহক মার্কো লরেঞ্জি, অঙ্গাস লাও এবং টমি সে।

মহাকাশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নাটালিয়া লিওয়ান্ডোস্কা ছবিটির বিবরণে বলেছেন যে এটি আসলে একটি বিকৃত ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি। এমনিতেই ছায়াপথগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। গ্যালাক্সিগুলিতে মহাকর্ষ বল একাই তারা, ধুলো, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস, নাক্ষত্রিক অবশিষ্টাংশ এবং অন্ধকার পদার্থের বিশাল সংগ্রহকে একত্রিত করে রাখে। আজকের ছবিটিতেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ছবিটিতে দেখা গেছে অনেক গুলো তারা একত্রে একটি ছায়াপথের রূপ দিয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় ছবিটি হল এনজিসি 5128 যা "সেন্টাওরাস এ" বা "সেন এ" নামে পরিচিত। এটি আকাশের পঞ্চম উজ্জ্বল ছায়াপথ এবং পৃথিবী থেকে প্রায় 12 মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। "সেন এ"-এর বিকৃত আকৃতি একটি উপবৃত্তাকার এবং একটি সর্পিল ছায়াপথের মধ্যে একত্রিত হওয়ার ফল। এর সক্রিয় গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াসে একটি 'সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল' বা বিশালাকার কৃষ্ণ গহ্বর অবস্থান করে যা আকারে আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় 55 মিলিয়ন গুণ বড়। এই কেন্দ্রীয় ব্ল্যাক হোল রেডিও এবং এক্স-রে উভয় আলোতে দৃশ্যমান একটি দ্রুত জেট বা জ্বলজ্বলে গ্যাসীয় প্রবাহ নিষ্কাশন করে। জেটের ফিলামেন্টগুলি চিত্রে উপরের বাম দিকে লাল রঙে দৃশ্যমান। 'ইভেন্ট হরাইজন' টেলিস্কোপের নতুন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী জেটটি শুধুমাত্র তার প্রান্তের দিকে উজ্জ্বল—কিন্তু এর কারণ বর্তমানে বিজ্ঞানীদের অজানা। তাই এই অদ্ভুত আলোকচিত্রটি মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার একটি সক্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছে।

সেন্টাওরাস এ

ভূত নীহারিকা ও তার প্রতিফলন

তারা এবং ধূলিকণার এই আন্তঃনাক্ষত্রিক জগৎ থেকে কোন আকার আপনার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে মনে হয়?

— কী ভাবছেন? এ আবার কেমন ভূতুড়ে প্রশ্ন!

হুমম; নাসার বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এমনই একটি ভূত নীহারিকা বা ঘোস্ট নেবুলার ছবি প্রকাশ করেছেন, তাতে রীতিমতো সবাই ব্যতিব্যস্ত! তবে নিশ্চিন্তির কথা হলো ছবিটি আসলে একটি প্রতিফলন নীহারিকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য।

জ্যোতির্বিদ্যায় প্রতিফলন নীহারিকা হল আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণার মেঘ যা কাছাকাছি কোন তারা বা তারার আলো প্রতিফলিত করতে পারে। একটি নির্গমন নীহারিকা তৈরি করার জন্য নিকটবর্তী নক্ষত্র থেকে পাওয়া শক্তি নীহারিকাটির গ্যাসকে আয়নিত করার জন্য অপর্যাপ্ত, তবে ধূলিকণাকে দৃশ্যমান করার জন্য প্রয়োজনীয় বিক্ষিপ্তকরণের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং, প্রতিফলন নীহারিকা দ্বারা প্রদর্শিত ফ্রিকোয়েন্সি বর্ণালী আলোকিত নক্ষত্রের মতই।

নাসা কতৃক প্রকাশিত চিত্রটিতে দৃশ্যমান রত্নখচিত বিস্তৃতি, ম্লান, তারার আলো-প্রতিফলিত মেঘজটলা রাজকীয় সেফিয়াস নক্ষত্রমণ্ডলের চারদিকে রাতভর পাঁয়চারি করে; আমাদের গ্রহ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। এই ভৌতিক দৃশ্যগুলি প্রায় 1200 আলোকবর্ষ দূরে সেফিয়াস তারামন্ডলের আণবিক মেঘপুঞ্জের প্রান্তে পৃথিবীর ছায়াপথ দ্য মিল্কিওয়ের সমতল বরাবর বিচারণ করছে। দুই আলোকবর্ষ দূরত্বের ব্যাস বিশিষ্ট এই প্রতিফলিত নীহারিকা অন্যান্য ভুতুড়ে মহাকাশ নিদর্শের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল; জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে VdB 141 বা Sh2-136 নামেও চিহ্নিত করা হয়। তবে নিসর্গ চিত্রগ্রাহক বডগান জার্জায়না একে ভূত নীহারিকা বা ঘোস্ট নেবুলা নামে পরিচয় দিয়েছেন।

ওই বিচিত্র মহাকাশে অবস্থিত প্লিয়েডেস বা দ্য সেভেন সিস্টারস্ বা মেসিয়ার 45 নাক্ষত্রিক ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত টাওরাস নক্ষত্রমন্ডলের মেরোপ বা 23 টাউরি/টাউ নক্ষত্রের সাথে যুক্ত নীহারিকাটির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে, বিজ্ঞানী ভেস্টো স্লিফার 1912 সালে এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে এর আলোর উৎস সম্ভবত নক্ষত্র নিজেই, এবং নীহারিকা নক্ষত্র থেকে আলো প্রতিফলিত করে। 1914 সালে বিজ্ঞানী এজনার হার্টস্প্রাঞ্জ দ্বারা গণনা সেই অনুমানকে বিশ্বাস করে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল 1922 সালে নির্গমন এবং প্রতিফলন নীহারিকাগুলির মধ্যে আরও পার্থক্য করেছিলেন। তবে প্রতিফলন নীহারিকার মধ্যে তারা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ঘন কোর বা মজ্জা পতনের কল্পিত লক্ষণ আছে।

ভূত নীহারিকা

মহাজাগতিক শুঁয়োপোকা

আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসার অধীনস্থ হাবল্ টেলিস্কোপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এক আলোকবর্ষ দূরত্বের সমান দৈঘ্য বিশিষ্ট সুবিশাল গ্যাস ও ধূলিকণার পিন্ড। আপাতদৃষ্টিতে ওই দীর্ঘ পিন্ডটিকে শুঁয়োপোকার মতো দেখতে বলে বিজ্ঞানীগণ এর নাম দিয়েছেন কসমিক ক্যাটারপিলার বা মহাজাগতিক শুঁয়োপোকা।

পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই পিন্ড টির লম্বাকৃতি আসলে মহাকাশে উপস্থিত অন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের থেকে অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ। নামকরণ করেছেন আইআরএএস 20324+4057। গবেষণায় দেখা গেছে এটি একটি আগামীদিনের পূর্ণ নক্ষত্র হতে চলেছে; বর্তমানে এই শিশু-নক্ষত্রটি একদমই তার প্রাথমিক গঠনমূলক পর্যায়ে আছে। লক্ষনীয় এই যে, মহাকাশস্থিত সিগনাস-ওবি2 নামে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের তীব্র বিকিরণ হেতু উৎপন্ন গ্যাসীয় পরিকাঠামোর থেকে পদার্থ সংগ্রহ করে নিজেকে পূর্ণ নক্ষত্রের রূপ দেওয়ায় প্রক্রিয়াশীল এই কসমিক ক্যাটারপিলার। যাক তাহলে ওই রাতের আকাশে আমরা চাঁদ মামার সাথে আরও এক মিষ্টি তারার দেখা পাব!

নৈসর্গিক শুঁয়োপোকা নীহারিকা

লেখক ***শ্রী তুহিন সাজ্জাদ সেখ*** *বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞান কর্মী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল:* sk.sajjadtuhin14@gmail.com

ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

জোসেফ লুই গে লুসাক

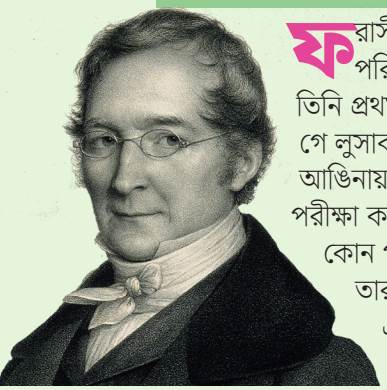

ফরাসী রসায়নবিদ জোসেফ লুই গে লুসাক কেবলমাত্র রসায়ন নয়, বরং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার ছাত্রদের কাছে এক পরিচিত নাম। তবে তার সেই পরিচিতি রয়েছে 'গে লুসাক' নামে । 1778 সালের 11ই ডিসেম্বর তার জন্ম হয়। তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন যে জল রাসায়নিক ভাবে দুই অংশ হাইড্রোজেন ও এক অংশ অক্সিজেনের অনুপাতে গঠিত। গে লুসাক তার সময়ে ফ্রান্সের সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন কারণ তার গবেষণাক্ষেত্র কেবল রসায়নের আঙিনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বেলুনে করে প্রায় 21000 ফুট পর্যন্ত উঠেছিলেন। তার আগ্রহ ছিল হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখা উচ্চতার সঙ্গে বায়মন্ডলের বাতাসের গঠন অর্থাৎ বাতাসে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাতের কোন পার্থক্য ঘটে কিনা। কিংবা বায়ুচাপের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর মধ্যেকার বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাতের কোন তারতম্য হয় কিনা। মৌলিক পদার্থ বোরনের তিনি অন্যতম আবিষ্কারক, তার কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি একটি এমন সূত্র যার সাহায্যে জানা সম্ভব যখন একাধিক গ্যাস রাসায়নিক ভাবে যুক্ত হবে তখন তাদের মধ্যে কীরকম অনুপাত লক্ষ করা যাবে। ●

স্যার আইজাক নিউটন

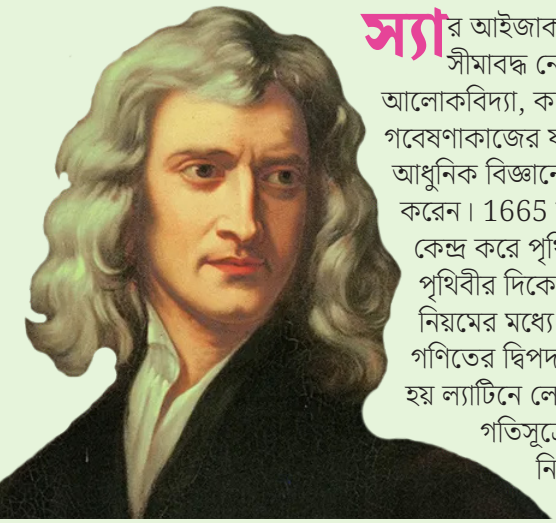

স্যার আইজাক নিউটন নামটির সঙ্গে মানুষের পরিচয় কেবল পদার্থবিদ্যা বা বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা মুখ্যত তাকে ভৌত বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জানি, কিন্তু বীজগণিত, আলোকবিদ্যা, ক্যালকুলাস, জ্যোর্তিবিজ্ঞান এইরকম নানা শাখায় তার প্রথম সারির অবদান রয়েছে। তার গবেষণাকাজের ফল বিজ্ঞানের বহু শাখায় প্রযুক্ত হয়েছে এবং তার দেওয়া অনেকগুলি সূত্র ও নীতি একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 1642 সালের 25শে ডিসেম্বর তিনি ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। 1665 সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে নিউটন সার্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী বা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ যে নিয়ম মেনে আবর্তিত হয় সেই একই নিয়ম মেনে যে পৃথিবীর দিকে গাছ থেকে পড়া আপেল নেমে আসে তা তিনি এই সূত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে এই সাধারণীকরণের হদিশ পাওয়া নিউটনের প্রতিভার এক সাক্ষর। ওই একই বছরে তিনি গণিতের দ্বিপদ উপপাদ্যের (Binomial Theorem) প্রমাণ উপস্থাপনা করেন। 1687 সালে প্রকাশিত হয় ল্যাটিনে লেখা তার বিখ্যাত গ্রন্থ যা আমরা প্রিন্সিপিয়া নামে জানি। এখানে তিনি তার তিনটি বিখ্যাত গতিসূত্রের বিষয়টি তুলে ধরেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের লুকাসিয়ান প্রফেসর পদে নিউটন ছিলেন দ্বিতীয় ব্যাক্তি। 1703 থেকে 1727 সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ●

ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ

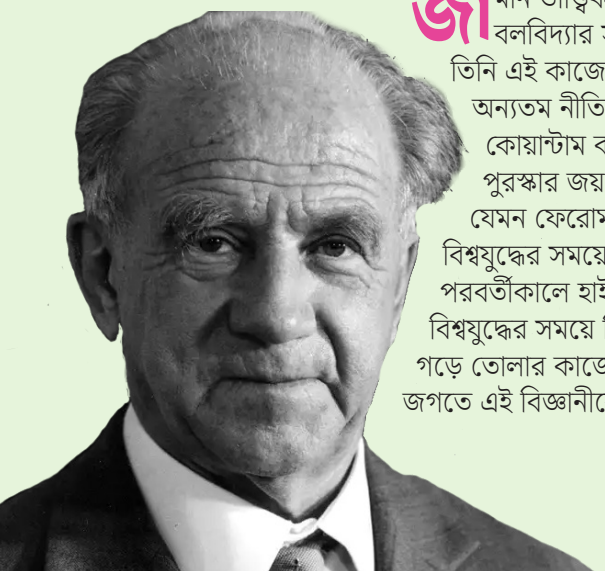

জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ 1901 সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূচনা যাদের হাত ধরে হয়েছিল তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি এই কাজে বিশেষ অবদান রাখেন। তারপর 1927 সালে তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি অন্যতম নীতি উপস্থাপনা করে। এখন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি নামে পরিচিত এই নীতিটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। 1932 সালে তিনি পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার জয় করেন। হাইজেনবার্গ পদার্থবিদ্যার আরও কয়েকটি শাখায় তার অবদান রাখেন, যেমন ফেরোম্যাগনেটিজম, কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মি, কেন্দ্রকীয় পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি জার্মানির পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রকল্পের অধিকর্তা ছিলেন। তাছাড়া ওই যুদ্ধ পরবর্তীকালে হাইজেনবার্গ জার্মানিতে গবেষণার জন্য পারমাণবিক চুল্লী গড়ে তুলতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি নাৎসী জার্মানির বিজ্ঞানের এক প্রথম সারির মুখ হওয়া সত্ত্বেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা গড়ে তোলার কাজে এবং বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার অগ্রগতিতে তার অসামান্য অবদান পদার্থবিদ্যার জগতে এই বিজ্ঞানীকে এক অনন্য স্থান দিয়েছে। ●

শ্রীনিবাস রামানুজন

শ্রীনিবাস রামানুজন 1887 সালের 22শে ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর এরোডে এক সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বেশ দুর্বল। রামানুজন যখন বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র তখনই লক্ষ করা যায় যে গণিতে তার রয়েছে প্রবল আগ্রহ এবং অসাধারণ দক্ষতা। তিনি একদিকে উচ্চতর গণিতে ছিলেন অতি সচ্ছন্দ, অন্যদিকে পাঠ্যক্রমের বাকি বিষয়গুলিতে তার একেবারেই নজর ছিল না। তাই বিদ্যালয় স্তরের পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে তার সাফল্য আসে নি। তৎকালীন মাদ্রাজ (এখনকার চেন্নাই) শহরে সাধারণ একটি চাকরি করার সময় তার গণিত প্রতিভা বেশ কয়েকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 1913 সালে তার পাঠানো একটি চিঠিতে মাত্র কয়েকটি পাতায় তিনি যে গণিত বিষয়ে যে মৌলিক চিন্তা ভাবনার ছাপ রেখেছিলেন তা ব্রিটিশ গণিতবিদ জি এইচ হার্ডির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হার্ডির উদ্যোগে রামানুজন 1913 সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে উপস্থিত হন। রামানুজনের গাণিতিক প্রতিভা সকলের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে হার্ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যে কোন সংখ্যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার কাজে তিনি ছিলেন অতি দক্ষ। রামানুজন সংখ্যা বা রামানুজন হার্ডি সংখ্যা নামে পরিচিত 1729 কে রামানুজন প্রথম দুটি ভিন্ন সংখ্যার ঘনকের যোগফল ($1729 = 12^3 + 1^3 = 10^3 + 9^3$) হিসেবে দেখান, এবং বোঝা যায় এটি একটি বিশেষ সংখ্যা। এই ধরণের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সংখ্যার মধ্যে এই 1729 ই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম। শোনা যায় যে হার্ডি ওই 1729 নম্বরের একটি ট্যাক্সি চড়ে রামানুজনকে হাসপাতালে দেখতে এসেছিলেন এবং তিনি আপাতভাবে সংখ্যাটিতে একেবারেই মনোযোগ দিতে চাননি। খুব দ্রুত তার গণিত প্রতিভা পশ্চিমের আগ্রহের সঞ্চার করে এবং তার মৌলিকত্ব স্বীকৃত হয়। কিন্তু তার স্বাস্থ্য ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নি এবং তার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। 1918 সালে তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। কিন্তু 1920 সালে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তার অকাল প্রয়াণে কেবল আমাদের দেশ নয় সারা পৃথিবীর গণিতের জগত এক বিস্ময়কর প্রতিভাকে হারায়। আমদের দেশে এখন রামানুজনের জন্মদিন অর্থাৎ 22শে ডিসেম্বর চিহ্নিত হয়েছে জাতীয় গণিত দিবস হিসেবে। ●

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

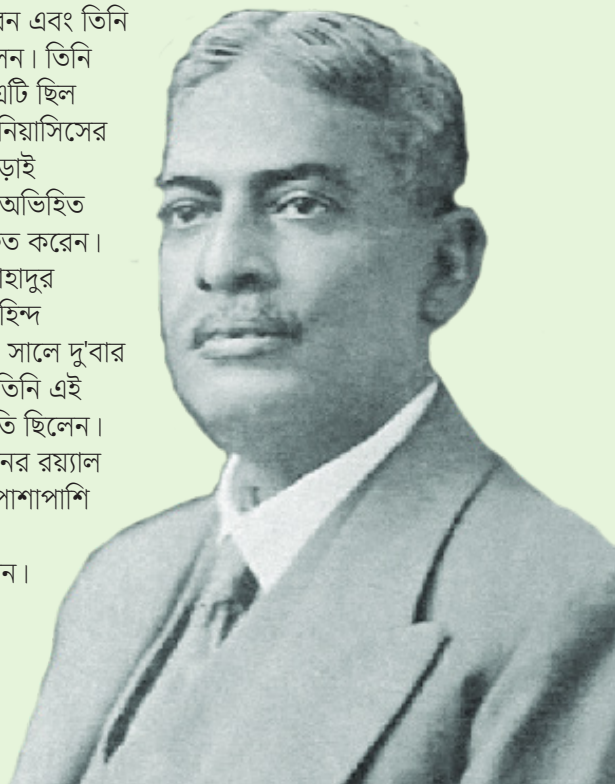

রায় বাহাদুর স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 1873 সালের 19 ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর সময়কালের একজন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি 1922 সালে ইউরিয়া-স্টিবামাইন (কার্বোস্টিবামাইড) সংশ্লেষিত করেন এবং সেইসময় এটি ছিল প্রাণঘাতী কালাজ্বরের একমাত্র কার্যকর ওষুধ। এছাড়াও 1922 সালে ব্রহ্মচারী লেশম্যানিয়াসিসের একটি নতুন মারাত্মক রূপ আবিষ্কার করেছিলেন। জ্বর বা অন্যান্য আনুসাঙ্গিক লক্ষণ ছাড়াই রোগীদের মুখে হঠাৎ ক্ষতের চিহ্ন দেখা যায়। তিনি এটিকে ডার্মাল লেশম্যানয়েড নামে অভিহিত করেন এবং এটিকে কালাজ্বরের আংশিক নিরাময়ের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করেন। এর পর থেকে এটিকে কালাজ্বর পরবর্তী ডার্মাল লেশম্যানিয়াসিস বলা হয়। তিনি রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন এবং 1924 সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন কর্তৃক কায়সার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। 1934 সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইটহুড প্রদান করে। 1929 সালে দু'বার এবং 1942 সালে পাঁচবার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেও দুঃখের বিষয় যে তিনি এই পুরস্কার পাননি। তিনি ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 23তম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিন এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমির ফেলোশিপ এবং পাশাপাশি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর দুই বছরের জন্য (1928–29) সভাপতি হিসেবে সম্মানিত হন। এছাড়াও তিনি ভারতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। 1946 সালের 6ই ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়। ●

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ডিসেম্বর মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

প্রথম বিমান উড়ান

1903 সালের 17ই ডিসেম্বর বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐদিন প্রথম বাতাসের চেয়ে ভারী কোনো যন্ত্রকে সফলভাবে বাতাসে উড়তে দেখা যায়। এই যন্ত্রের ওড়ার মাধ্যমেই রাইট ভাতৃদ্বয় বায়বীয় পরিবহন যুগের সূচনা করেছিলেন।

উইলবার এবং অরভিল রাইটের 1899 সাল থেকে চার বছর ব্যাপী গবেষণার ফসল ছিল এই উড়ন্ত যান যার নাম রাখা হয়েছিল দ্য রাইট ফ্লায়ার। তিনটি পূর্ণ-আকারের গ্লাইডার তৈরি এবং পরীক্ষা করার পর, রাইট ভাতৃদ্বয়ের প্রথম চালিত বিমানটি উড়েছিল উত্তর ক্যারোলিনার কিটি হকে। বিমানটি অরভিলের চালনায় 12 সেকেন্ডে 36 মিটার (120 ফুট) এবং উইলবারের নিয়ন্ত্রণে 59 সেকেন্ডে 255.6 মিটার (852 ফুট) যাত্রা করে। 1904–1905 সালে রাইট ভাতৃদ্বয় দীর্ঘস্থায়ী উড়ানসক্ষম বিমান রাইট ফ্লায়ার II তৈরি করেন, যার পরে প্রথম সত্যিকারের ব্যবহারিক বিমান, রাইট ফ্লায়ার III নির্মাণ করা হয়। রাইট ভাতৃদ্বয় আধুনিক বৈমানিক প্রকৌশলের অনেক মৌলিক নীতি এবং কৌশলগুলির পথপ্রদর্শক। যেমন বায়ু সুড়ঙ্গের ব্যবহার এবং নকশার সরঞ্জাম হিসাবে ফ্লাইট পরীক্ষা। তাদের মৌলিক কৃতিত্ব শুধুমাত্র একটি বিমানের প্রথম উড়ান নয়, বরং অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভিত্তি স্থাপনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

রেডিয়াম আবিষ্কার

1898 সালের 21 ডিসেম্বর তারিখে মারি স্কলোডভস্কা-কুরি এবং তার স্বামী পিয়েরে কুরি দ্বারা রেডিয়াম আবিষ্কৃত হয়, যা ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। প্রথমে পিচব্লেন্ড (ইউরানিনাইট) খনিজটি অধ্যয়ন করার সময় কুরি দম্পতি এটি থেকে ইউরেনিয়াম অপসারণ করার পর দেখতে পান যে অবশিষ্ট উপাদানটি তখনও তেজস্ক্রিয় ছিল।

1898 সালের জুলাই মাসে ইউরেনাম অপসারিত পিচব্লেন্ড থেকে তারা বিসমাথের মতো তেজস্ক্রিয় একটি উপাদান বিচ্ছিন্ন করেন এবং তাদের জন্মভূমি পোল্যান্ডের নামে নতুন আবিষ্কৃত মৌলটির নাম রাখা হয় পোলোনিয়াম। তারপরে তারা অবশিষ্ট আকরিক থেকে দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত একটি তেজস্ক্রিয় মিশ্রণকে বিচ্ছিন্ন করেন। এর মধ্যে একটি ছিল বেরিয়ামের যৌগ, যা একটি উজ্জ্বল সবুজ শিখার রঙ দেয়। সাথে ধরা পরে আর একটি অজানা তেজস্ক্রিয় যৌগ যা কারমাইন বর্ণালী রেখা দেয় এবং এই ঘটনা আগে কখনও নথিভুক্ত করা হয়নি। কুরি দম্পতি দেখেন, এই তেজস্ক্রিয় যৌগটির বেরিয়াম যৌগগুলির সাথে খুব মিল আছে, তবে তারা কম দ্রবণীয়। এই যৌগটির বিশ্লেষণের ফলে তারা একটি নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল খুঁজে পান। 1898 সালের 26 ডিসেম্বর ফরাসি একাডেমি অফ সায়েন্সে কুরি দম্পতি তাদের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। আধুনিক ল্যাটিন ভাষায় ব্যাসার্ধ ব্যাপী রশ্মিপথে শক্তির নির্গমনের কথা চিন্তা করে এই নতুন অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় মৌলটির নামকরণ হয় রেডিয়াম। 1910 সালের সেপ্টেম্বরে, মেরি কুরি এবং আন্দ্রে-লুই ডেবিয়র্ন ঘোষণা করেন যে তারা বিশুদ্ধ রেডিয়াম ক্লোরাইড ($RaCl_2$) দ্রবণের ইলেক্ট্রোলাইসিসের মাধ্যমে একটি পারদ ক্যাথোড ব্যবহার করে বিশুদ্ধ ধাতু হিসেবে রেডিয়ামকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং রেডিয়াম-পারদ অ্যামালগাম তৈরি করেছেন। এই অ্যামালগামটিকে হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে উত্তপ্ত করে বিশুদ্ধ রেডিয়াম ধাতু পৃথক করা হয়। রেডিয়াম আবিষ্কারের ফলে তেজস্ক্রিয়তা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব উপস্থাপনা

1900 সালের 14ই ডিসেম্বর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন হয়ে আছে। ওইদিন জার্মানির বার্লিনে প্রুসিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের এক বিজ্ঞান সভায় বিয়াল্লিশ বছর বয়সী জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক উপস্থাপনা করলেন একটি যুগান্তকারী তত্ত্ব। তিনি বললেন এবং গণনার সাহায্যে দেখালেন যে, আলো বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ কেবল তরঙ্গ নয় তার মধ্যে রয়েছে কণিকার ধর্মও। এই কণিকাকে তিনি অভিহিত করেন 'কোয়ান্টা' (quanta) নামে যার উৎস হচ্ছে ল্যাটিন এবং যার অর্থ হচ্ছে 'সুনির্দিষ্ট পরিমাণ'। সেই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানী মহলের কাছে গৃহিত ধারণা ছিল যে বস্তুর মধ্যে রয়েছে কণার চরিত্র আর শক্তির মধ্যে রয়েছে তরঙ্গের ধর্ম। যেমন লোহা, জল বা বাতাসের মধ্যে উপাদানগুলি গঠিত কণিকার সাহায্যে; আর আলো বা শব্দের মত শক্তি চলে তরঙ্গের আকারে। বিশেষ করে আলোক সংক্রান্ত বহু পরিঘটনা যেমন, ব্যবর্তন, সমবর্তন বা আলোর বিক্ষেপণ, প্রতিফলন প্রভৃতি ঘটনা আলোর তরঙ্গ চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় তাই আলোর কণিকা চরিত্রের অস্তিত্বের কথা ছিল এক বৈপ্লবিক ঘোষণা। কিন্তু আমরা এখন জানি যে আলো বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরং প্রকৃতপক্ষে কণা ও তরঙ্গ উভয় চরিত্র দেখাতে সক্ষম, কেবল কোন চরিত্র সে দেখাবে তা নির্ভর করে পরীক্ষার ওপরে এবং একই পরীক্ষায় দু'দুটি চরিত্র ধরা দেয় না। বিজ্ঞানে পরীক্ষালব্ধ ফলের বিশেষ স্থান রয়েছে। তবে সেই পরীক্ষা হওয়া চাই এমন, যে তা একই শর্ত মেনে করলে একই ফল দেবে তা জায়গাটা ভারতবর্ষ বা ইওরোপ বা আমেরিকা যেখানেই হোক না কেন। অন্যদিকে তত্ত্ব, তা সে যত গাণিতিকভাবে যত ছিমছাম বা মজবুতই হোক না কেন পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তাকে যাচাই করেই স্থির হবে তার গ্রহণযোগ্যতা। প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব প্রয়োগ করে খুব দ্রুত কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ও আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা মেলে। পরবর্তীকালে এই তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার জন্য উন্মোচন করেছে এক নতুন দিগন্ত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগতের কথা জানার জন্য এই তত্ত্ব হচ্ছে এক অন্যতম চাবিকাঠি।

প্রথম থাইরক্সিন নিষ্কাশন

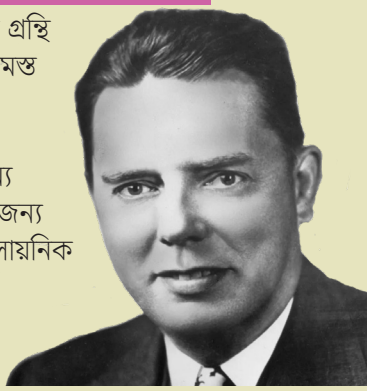

1914 সালের 25শে ডিসেম্বর আমেরিকান রসায়নবিদ এডওয়ার্ড ক্যালভিন কেন্ডাল প্রথম শূকরের থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নিষ্কাশন করেছিলেন। থাইরক্সিন রক্তে থাইরয়েড হরমোনের প্রধান রূপ এবং মানবদেহের সমস্ত কোষের বিকাশ এবং বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং চর্বিজাতীয় খাদ্যকণার বিপাকীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য অপরিহার্য। থাইরয়েড গ্রন্থি দ্বারা উৎপন্ন থাইরক্সিনের অভাবের ফলে হাইপোথাইরয়েডিজম রোগ হয়। হাইপোথাইরয়েডিজম শিশুদের অনেক বিকাশজনিত সমস্যা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিপাকীয় ব্যাধিগুলির জন্য দায়ী। মায়ো ক্লিনিকে এডওয়ার্ড কেন্ডাল এবং তার সহকর্মীরা থাইরক্সিনকে বিচ্ছিন্ন এবং কেলাসে পরিণত করার জন্য 6500 পাউন্ডের বেশি থাইরয়েড গ্রন্থি ব্যবহার করেছিলেন। এই প্রাথমিক নিষ্কাশন 1926 সালে থাইরক্সিনের রাসায়নিক গঠন নির্ধারণের সাথে আরও নতুন গবেষণার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। বহু বছরের গবেষণার পর গ্ল্যাক্সো 1949 সালে থাইরক্সিনের বাণিজ্যিকীকরণ শুরু করে। বর্তমানে লেভোথাইরক্সিন হাইপোথাইরয়েডিজমের প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর প্রয়োগে আক্রান্ত রোগীদের জীবনযাত্রার মান ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে থ্যারোক্সিন নিষ্কাশন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।

সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা স্কেল উদ্ভাবন

1742 সালের 25শে ডিসেম্বর সুইডিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যান্ডার্স সেলসিয়াস সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা স্কেল প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি প্রাচীনতম সুইডিশ বৈজ্ঞানিক সমাজ উপসালার রয়্যাল সোসাইটি অফ সায়েন্সেসের কাছে একটি গবেষণাপত্রে এই সেন্টিগ্রেডে তাপমাত্রার স্কেল প্রস্তাব করেছিলেন। সেলসিয়াসের মৃত্যুর পরে তাপমাত্রা স্কেলটির নতুন নামকরণ করা হয় সেলসিয়াস। সেন্টিগ্রেড ল্যাটিন শব্দ সেন্টাম (100) এবং গ্র্যাডস (পদক্ষেপ) থেকে এসেছে। এই পদ্ধতিতে জলের স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক—এই দুটি চরম তাপমাত্রা বিন্দুর মধ্যে ব্যবধানকে 100টি সমান ভাগে ভাগ করে তাপমাত্রা মাপা হয়। আদর্শ ঘনত্বের 1 গ্রাম জলে 1 ক্যালোরি তাপ প্রয়োগের ফলে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় তাকেই 1 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ধরা হয়। মজার বিষয় হল, অ্যান্ডার্স মডেলে দুটি চরম তাপমাত্রার মূল অবস্থান বর্তমান ধারণার বিপরীত ছিল, অর্থাৎ জলের হিমাঙ্ক 100 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাঙ্ক 0 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নির্দিষ্ট ছিল। 1744 সালে সেন্টিগ্রেড/সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিমাপের এই দুই মানোকের পরস্পর অবস্থান পরিবর্তন করা হয় এবং বর্তমান ব্যবস্থায় এই নিয়মই মানে চলা হচ্ছে।

গ্রন্থ সমালোচনা

আলোকবিদ্যার ইতিকথা

আলোকবিদ্যার ইতিকথা
ড. গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়
ISBN: 978-81-7480-422-8
পৃষ্ঠা: 72 | মূল্য: 100.00

আলো আমাদের অনেক কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কেবল আমাদের চারদিকের জগৎ নয়, আলোর সাহায্যে দেখতে পাই আরও বহু কিছু। মানুষ আগাগোড়াই আলো ব্যবহার করেছে নানা জিনিস প্রত্যক্ষ করার জন্য, অবশ্যই সেই কাজে তার অন্যতম হাতিয়ার ছিল প্রকৃতিদত্ত তার দুটি সন্ধানী-যন্ত্র বা ডিটেক্টর অর্থাৎ চোখ। তবে আলোকিত বস্তুর ওপরে আমাদের যে পরিমাণ দৃষ্টি পড়েছে আলোর প্রতি আমরা ততটা মনোযোগী সম্ভবত আমরা হইনি।

এই কাজটি হাতে তুলে নিয়েছেন গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় যিনি কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকই নন, সঙ্গে সঙ্গে যিনি পালন করছেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিবের দায়িত্ব এবং বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার ব্যাপারে যার রয়েছে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। বিজ্ঞান প্রসার প্রকাশিত আলোকবিদ্যার ইতিকথা-য় বেশ স্বল্প পরিসরে (66 পৃষ্ঠায়) তিনি আলোর একটি সুন্দর পরিচয় তুলে ধরেছেন।

তিনি শুরু করেছেন আলো সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক পন্ডিতদের ধ্যানধারণা দিয়ে। দেখা যাচ্ছে যে সেই সময়কার প্রসিদ্ধ পন্ডিত প্লেটো মনে করতেন যে আলো চোখ থেকে বার হয়ে বস্তুর ওপরে পড়ে এবং আমরা বস্তুকে দেখতে পাই। স্বভাবতই অন্ধকার ঘরে কেন চোখ খোলা রাখলেও সেখান থেকে আলো নির্গত হয়ে ঘরের বস্তুকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করে না তার উত্তর এখানে ছিল না। লেখক এই জায়গা থেকে আমাদের আলোর 'গতিপথ' বলতে শুরু করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে গ্রীক সভ্যতার অবসানের অনেক পরে খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরব পন্ডিতেরা বিজ্ঞান নিয়ে যে চর্চা শুরু করেছিলেন তার মধ্যে দিয়ে আলোর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। আলোর প্রতিফলনের সূত্র বা আলোর প্রতিসরণের নিয়মগুলি সেই সময়েই প্রাথমিক রূপ পায়। তারপর যখন কোপারনিকাস আকাশ পর্যবেক্ষণে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠে জ্যোর্তিবিদ্যার নানা বিষয় তুলে ধরেন তখন আলোর ধর্ম আরো ব্যাপক ভাবে বোঝার জন্য শুরু হয় আর একটি পর্যায়। আমরা এখন জানি যে তারপর আলোর গতিবেগের একটি নির্দিষ্ট মান রয়েছে এবং তা অসীম নয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা শুরু সেই সপ্তদশ শতকে যখন গ্যালিলিও এক প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন এই কাজে। পরে অষ্টাদশ শতকে ড্যানিশ বিজ্ঞানী রোমার উদ্যোগ নেন এবং একটি বিখ্যাত পরীক্ষা করেন যার কথা লেখক এই বইতে উল্লেখ করেছেন। তারপরে একে একে এসেছে, সার্বিক তড়িদচুম্বকীয় বর্ণালীর কথা, আমাদের চোখে ধরা দেয় না সেই সব তড়িদচুম্বকীয় তরঙ্গের কথা, তাদের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের কথা। এর মধ্যে দিয়ে আলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান একরকম পূর্ণতা পাচ্ছিল, কিন্তু সেখানে যেন খানিকটা আচমকাই এসে হাজির হল আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব। মানে তাকে হাজির হতে হলো। এভাবেই এগিয়েছে এই বই। এসেছে প্ল্যাঙ্কের সূত্র সংক্রান্ত সত্যেন্দ্রনাথ বোসের কাজ, যে কাজ বিজ্ঞানের অন্য দরজা খুলে দিয়েছে। আর আলোকে ঘিরে একেবারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কার উদ্ভাবনা লেজার, ফাইবার অপ্টিকস প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনাও রয়েছে। এগুলির প্রয়োগ আমাদের জীবনে এনেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। বইটিতে কিছু ছবি রয়েছে কিন্তু ছবির সংখ্যা আরও বেশি হলে ভাল হতো। এই বই সম্ভবত সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা হয়েছে, তবে বিজ্ঞানের ছাত্ররা বইটি পড়লে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রাই তো মানব সভ্যতার ইতিহাস।

কবি যথার্থই লিখেছিলেন, "আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা ....."।

ভূপতি চক্রবর্তী
(chakrabhu@gmail.com)

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh@sunpublish.com. প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।